এডগার রাইস বারোজ

MOHIT

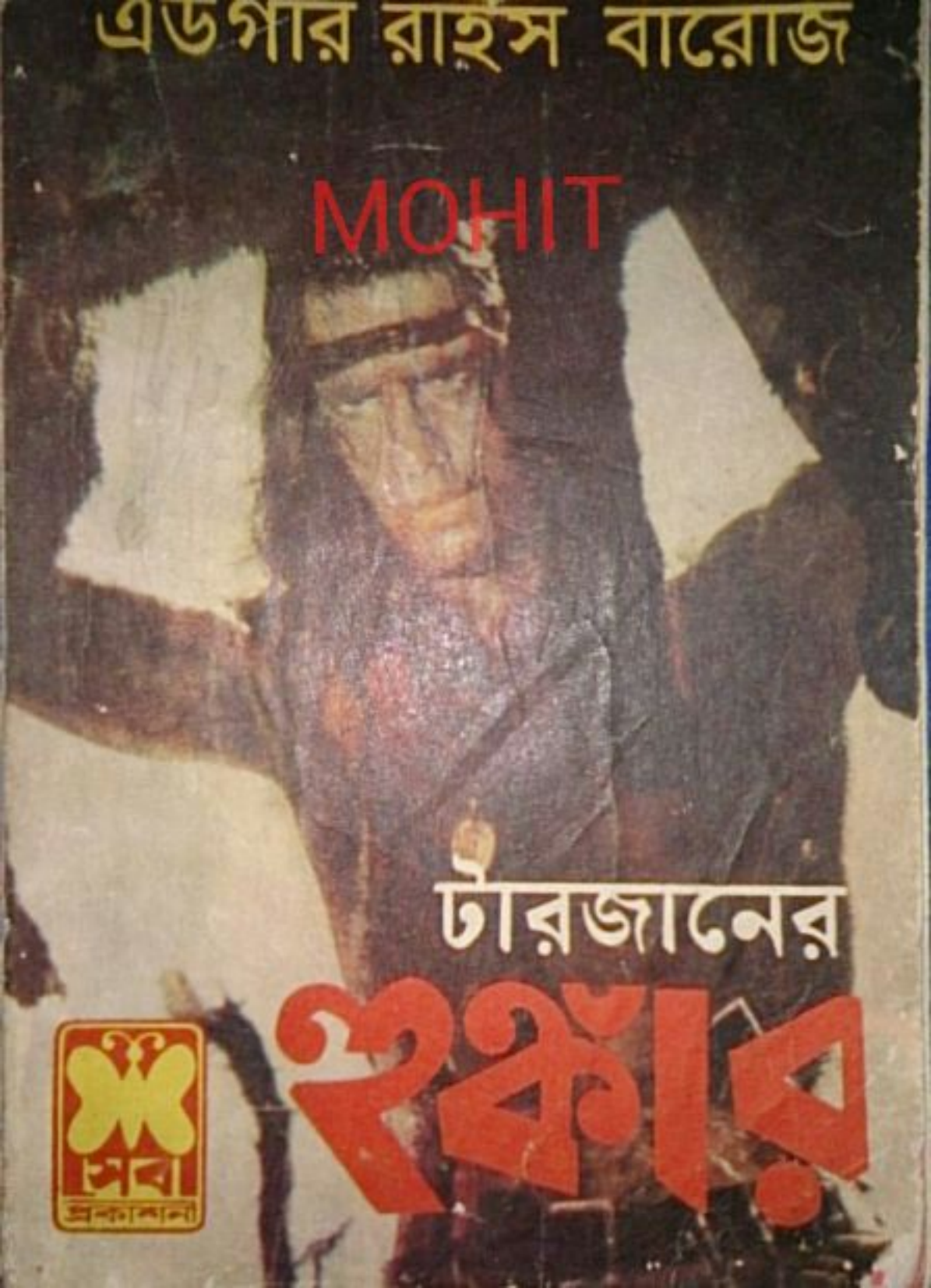

টারজানের হুঙ্কার

সবা প্রকাশনী

এডগার রাইস বারোজ-এর

দা বীস্টস্ অভ টারজান অবলম্বনে

টারজানের হুঙ্কার

রূপান্তর করেছেন

রকিব হাসান

আবার সেই কুখ্যাত খুনী নিকোলাস রোকোফ।
টারজানের স্ত্রী ও সন্তানকে ধরে নিয়ে গেছে।
জঙ্গল দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়েছে টারজানকে।

পাল্টা আঘাত হানবে এবার টারজান। তার
পাশে এসে দাঁড়ালো বনমানুষের দল,
আর এক ভয়ঙ্কর কালো চিতা।
ঢুকে গেল ওরা মানুষখেকো অংলীদের অঞ্চলে,
গভীর জঙ্গলের আরও গভীরে।
শুরু হলো এক প্রাণঘাতী লড়াই...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

আঠারো টাকা মাত্র

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

এক

কড়া রোদ। বালি আগুনের মতো তেতে উঠেছে পায়ের তলায়। স্তব্ধ হয়ে সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে বনের রাজা টারজান। ধীরে ধীরে দূরে জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা।

হাতের মুঠোয় চিঠিটা, গুঁজে দিয়ে গেছে এক নাবিক। খুলে পড়ার কথাও যেন মনে হচ্ছে না টারজানের। আফ্রিকার এই নির্জন সাগরতীরে ওকে কেন নামিয়ে দিয়ে গেল ওরা?

মাত্র দুই হপ্তা আগে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে লণ্ডনে ছিলো টারজান। ছেলে হওয়ার সংবাদ শুনে ছুটে গিয়েছিলো সে। কিন্তু দিন কয়েকেই হাঁপিয়ে উঠেছিলো শহুরে জীবনে। আবার জঙ্গলে ফেরার জন্যে আইটাই শুরু করেছিলো মন। ভেবেছিলো, ছেলে একটু বড় হয়ে উঠলেই তাকে আর জেনকে নিয়ে আবার ফিরে আসবে আফ্রিকায়। কিন্তু তা বোধহয় আর হলো না।

কিভাবে শুরু হয়েছিলো যেন ঘটনাটা? ও, হ্যাঁ, চিঠি। হাতেরটা নয়, আরেকটা। পাঠিয়েছিলো তার পুরোনো বন্ধু পল দ্য আর্নো। কি খুশি হয়েই না চিঠিটা খুলে ছিলো টারজান! তারপর? পড়ে

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো ক্ষণিকের জন্যে।

চিঠিতে লেখা : 'রোকোফ পালিয়েছে!'

রোকোফ—টারজানের ভয়ানক শত্রু, 'প্রতিশোধ নেবেই' বলে যে শাসিয়েছিলো জেলে যাবার আগে, পালিয়েছে! কিন্তু কি করে? সেটা দ্য আর্নোও বুঝতে পারেনি। ফ্রান্সের ডেভিল আইল্যাণ্ডের দুর্ভেদ্য কারাগার থেকে কি করে পালালো রোকোফ? তা পালাতেই পারে। তার পেছনে মস্ত শক্তিশালী হাত রয়েছে, তার ওপর রয়েছে প্রচুর টাকা। টাকা দিয়ে কেনা যায় না, এমন জিনিস আছে নাকি পৃথিবীতে?

যাই হোক, তারপর থেকেই অনেক বেশি সতর্ক হওয়া দরকার ছিলো টারজানের। হয়নি বলে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে এখন। তবে এতো তাড়াতাড়িই আঘাত হেনে বসবে নিকোলাস রোকোফ, কল্পনাও করেনি। 'কিনশেড'-এর ছোট্ট কুঠুরিতে বন্দি হয়েছিলো, ভাবতেই আবার তেতো হয়ে গেল টারজানের মন।

টারজানের ছেলে, শিশু জ্যাককে চুরি করেছে রোকোফ। সেই সন্ধ্যার কথা এখনো ঝলমল করছে তার মনে। ছুটে এসেছিলো নার্স, যে জ্যাকের দেখাশোনা করতো। মুখ ফেকাসে। কোনোমতে জানিয়েছিলো, একটা গাড়ি করে এসেছিলো কয়েকজন ভয়ংকর চেহারার লোক। বাগানে, তার হাত থেকে জ্যাককে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে ওরা।

দেখছে টারজান, কিনশেডের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে নৌকা। ডেকে উঠে গেল নাবিকেরা। টেনে তুললো নৌকাটা। ভাবনায় এতোই

মা সে, খেয়ালই করলো না, পেছনের ঘন ঝোপঝাড় সরিয়ে উঁকি দিয়েছে একটা কুৎসিত মুখ। কুৎকুতে লাল চোখে তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকেই দেখছে।

নার্সের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলো টারজান। কিন্তু গাড়িটাকে দেখলো না। চলে গেছে ওটা। কয়েক ঘন্টা পরে এলো ফোন। রোকোফের উল্লসিত কণ্ঠ। জ্যাকের সম্পর্কে কথা বলতে চায়। লণ্ডনের কুখ্যাত পূর্ব-প্রান্তে জাহাজ ঘাটর একটা বিশেষ ঠিকানায় কি দেখা করতে পারবে টারজান? পারবে, অবশ্যই পারবে, জানিয়ে ছিলো সে। শর্ত দিয়েছিলো রোকোফ, একা যেতে হবে। সঙ্গে পুলিশ-টুলিশ নিয়ে যেতে পারবে না। সন্দেহজনক কোনো কিছু করলে জ্যাককে আর জ্যান্ত ফিরে পাবে না টারজান।

রোকোফকে চেনে টারজান। অনুমান করেছিলো, কোনো ধরনের ফাঁদ পেতেছে সে। তবু কোনো ঝুঁকি নিলো না। তার জীবনের বিনিময়ে হলেও শিশু জ্যাককে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চায়। গেল সে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে টারজানকে কিনশেডে তুলে না একটা লোক। একটা ছোট্ট কেবিনে নিয়ে ঢোকালো। ইস্পাতের দেয়াল, ইস্পাতের একটা মাত্র দরজা। টারজান ঢুকতেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো লোকটা। বন্দি হলো বনের রাজা।

জাহাজে ওরা কোনোরকম অত্যাচার করেনি টারজানের ওপর। ঠিক সময়ে দেয়ালের একটা ছোটো ফোকর দিয়ে খাবার সরবরাহ

করে যেতো বিশালদেহী, কুৎসিত চেহারার এক সুইডিশ। ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে টারজান। কিন্তু লোকটা বারবার একটাই কথা বলেছে, 'আমার মনে হয় শিগগিরই খুব শক্ত একটা আঘাত খাবেন।'

দিনের পর দিন পেরিয়েছে। একনাগাড়ে চলেছে জাহাজ, ইঞ্জিনের শব্দ আর ঢেউয়ের দোলাতেই বুঝতে পেরেছে টারজান। স্ত্রী-পুত্রের কথা ভেবে স্বস্তি পায়নি এক বিন্দু। একটি বারও দেখা করেনি রোকোফ। হয়তো এই মানসিক যন্ত্রণা দিয়েই ভয়ংকর প্রতিশোধের সূচনা করেছে সে!

তারপর, এই খানিক আগে থেমে গেছে জাহাজ। হঠাৎ খুলে গেছে কুঠুরির দরজা। হুড়মুড় করে এসে ঢুকেছে কয়েকজন বিশালদেহী নাবিক। বাধা দেবারও সময় পায়নি টারজান, তার আগেই তার হাত-পা বেঁধে ফেলেছে ওরা। বের করে নিয়ে এসেছে খোলা ডেকে। প্রচণ্ড গরম। বুঝতে পারছে সে, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে রয়েছে।

নৌকায় নামানো হলো টারজানকে। এই সময় রেলিঙে এসে দাঁড়ালো রোকোফ। শয়তানী হাসি হেসে বললো, 'যাও, টারজান, ওরা যেখানে নিয়ে যায়, যাও। খবরদার, বাধা দেবার চেষ্টা করবে না! তাহলে বাঁচবে না তোমার ছেলে!'

বাধা দেয়নি টারজান! তাকে তীরে নামিয়ে দিয়েছে নাবিকেরা। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছে। একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছে হাতে। তারপর আবার গিয়ে নৌকায় উঠে দাঁড় বেয়ে চলে গেছে।

তবু কিছু বলেনি সে। আসলে, কি করতে চাইছে তাকে নিয়ে রোকোফ, এটাই বুঝতে পারছে না। বিমূঢ় হয়ে গেছে সে।

ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি টারজান, একই জাহাজে করে নিয়ে আসা হয়েছে তার ছেলে আর স্ত্রীকে। তার মাথার ওপরের একটা কেবিনেই ছিলো ওরা। সেটা যদি কোনোভাবে জানতে পারতো, ইস্পাতের দেয়াল কেন, পৃথিবীর কোনো বাধাই আটকে রাখতে পারতো না তাকে।

ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে কিনশেডের। চিমনি দিয়ে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। দেখতে পাচ্ছে টারজান। সেদিন রাতে সে একাই বেরিয়ে পড়েছিলো বাড়িতে জেনকে রেখে। জানে না, তাকে অনুসরণ করে জাহাজ ঘাটায় এসেছিলো জেন। পড়েছে রোকোফের ফাঁদে।

ছেড়ে দিয়েছে কিনশেড। নাক ঘুরছে…

পেছনে অদ্ভুত একটা শব্দ হলো। পাঁই করে ঘুরলো টারজান। কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক পুরুষ বনমানুষ। রাগে জ্বলছে টকটকে লাল চোখ। তার রাজ্যে আরেক দু'পেয়ে এসে নেমেছে, সইতে পারছে না সে। তার পেছনেই রয়েছে আরো কয়েকটা বনমানুষ।

আক্রমণ করে বসলো রাজা। চাপা একটা গর্জন করে ছুটে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল টারজানের ওপর। জানে না সে, দুর্দান্ত টারজান শহরে গিয়ে সভ্য মানুষের মারপিটের অনেক মারাত্মক কায়দা রপ্ত করে এসেছে।

কয়েক বছর আগে হলে, বনমানুষের বিপুল বেগে ছুটে আসাকে

বিপুল গতি দিয়েই রোখার চেষ্টা করতো টারজান। কিন্তু এখন সেটা করলো না। চট করে সরে গেল এক পাশে। মাথা নিচু করে ছুটে এলো রাজা। কোনো কিছুতে ঠেকে প্রতিহত হলো না বিপুল গতি। পাশ দিয়ে যাবার সময় পেটে ভয়ানক আঘাত খেলো টারজানের হাতের।

ভয়ংকর কাতরাতে কোপ খেয়ে গর্জন বেরিয়ে এলো রাজার মুখ থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো আবার। দমাদ্দম কিল মারলো নিজের বুকে, গরিলাদের মতো। ছুটে এলো, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে।

হঠাৎ বাড়ানো একটা হাত ধরে ফেললো টারজান। জুজিৎসুর কায়দায় অনায়াসে আছড়ে ফেললো বিশাল দানবটাকে। আবার উঠে পড়ার আগেই প্রচণ্ড এক লাথি ঝাড়লো কানের একটু নিচে। হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল রাজা।

এক লাফে গিয়ে ওটার ওপর উঠে পড়লো টারজান। হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলো পিঠ। হাত ঢুকিয়ে দিলো গলার নিচে। তাকালো একবার চারপাশে।

তাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অন্য বনমানুষেরা। দেখছে লড়াই।

বেকায়দায় পড়ে গেছে রাজা। কিছুই করতে পারছে না। হাত আবড়াচ্ছে মাটিতে। মুখ চেপে আছে ঘাসে। পা নাচাচ্ছে। কিন্তু কোনোভাবেই শত্রুর নাগাল পাচ্ছে না।

আস্তে আস্তে হাতের চাপ বাড়ালো টারজান। ঘাস থেকে মাটিতে উঠছে রাজার মুখ। বিপদ টের পেয়েছে সে। কুৎকুতে লাল

চোখে আতংক ফুটলো। দম নিতে পারছে না ঠিকমতো। ঠোঁটের কোণে ফেনা।

দলের কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। দুই যোদ্ধায় লড়াই বাঁধলে তৃতীয় কারো এগিয়ে আসার নিয়ম নেই বনমানুষ-সমাজে। দেখছে ওরা, কে হারে কে জেতে!

আর উঠছে না রাজার মাথা। ওপর দিয়ে বাঁকা হয়ে আছে খাটো ঘাড়। দম বন্ধ হয়ে গেছে। ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে।

হঠাৎ ওপর দিকে হ্যাঁচকা টান মারলো টারজান। কট্‌ট্‌ করে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ উঠলো। চাপা আর্তনাদ মাঝপথেই মিলিয়ে গেল রাজার গলায়।

রাজার ওপর থেকে উঠে এলো টারজান। বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে বনমানুষটার ঘাড়। ভেঙে গেছে ভারটেব্রা। বার কয়েক হাত-পা নাচালো রাজা, তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা।

লড়াইয়ে জিতেছে। আবার আদিম প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে টারজানের। এক পা তুলে দিলো রাজার পিঠে। আকাশের দিকে চোখ তুলে দু'হাত মুখের সামনে এনে বিকট হাঁক ছাড়লো।

আর কোনো সন্দেহ রইলো না বনমানুষদের, জিতেছে ওই আজব শাদা মানুষটা। তাদের রাজা মৃত।

বনের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে ছড়িয়ে পড়লো বিজেতার প্রলম্বিত চিৎকার। গাছের ডালে স্তব্ধ হয়ে গেল বানরের কিচির-মিচির।

চুপ হয়ে গেল পাখপাখালির কলরব। উজ্জ্বল রঙের ডানা ঝাপটে আকাশে উঠে পড়লো পাখির একটা ঝাঁক। দূর থেকে ভেসে এলো চিতার তীক্ষ্ণ বিলাপের মতো ডাক, সিংহের ভারি গর্জন।

দ্রুতহাতে জামাকাপড় সব খুলে ফেলে দিলো টারজান। মাথার ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকুনি দিলো একবার। শরীরটাকে সামান্য বাঁকা করে দু'হাত ঈষৎ সামনে বাড়িয়ে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। ভুলে গেছে এখন স্ত্রী-পুত্রের কথা। আবার সেই আদিম বুনো টারজান-রূপ। চোখে হত্যার নেশা।

একটা তরুণ বনমানুষ, আগের রাজার মৃত্যুর পর রাজা হবার কথা তার। কিল মারলো বিশাল বুকে। তীক্ষ্ণ দাঁত খিঁচিয়ে বিকট মুখভঙ্গি করলো। চাপা একটা গর্জন বেরোলো গলা থেকে। হুমকি দিচ্ছে।

স্থির দাঁড়িয়ে রইলো টারজান। দেখছে বনমানুষটাকে। ওটার আক্রমণের প্রতীক্ষা করছে।

রাজার মতো ছুটে এলো না এই বনমানুষটা। দেখেছে, বোকার মতো ছুটে আসার কি পরিণতি। বুঝেশুনে পা ফেলবে সে। আস্তে করে দু'পা এগিয়ে এলো আরো। টারজানকে কেন্দ্র করে ঘুরতে শুরু করলো। পেছন থেকে আক্রমণ করার ইচ্ছে।

সে সুযোগ দিলো না টারজান। বনমানুষটাকে সামনা সামনি রেখে সে-ও ঘুরতে লাগলো। ওটার হাতের নাগালে যাওয়া চলবে না।

বিশালদেহী বনমানুষ, প্রায় সাত ফুট লম্বা। সেই অনুপাতে

চওড়া। লম্বা লম্বা দুই হাত মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। রোমশ কালো শরীর।

দুজনে দুজনকে সামনে রেখে কিছুক্ষণ ঘুরলো দুই যোদ্ধা। কেউই কারো নাগালের মাঝে এলো না।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো টারজান। 'বনের রাজা টারজানের সঙ্গে লড়তে এসেছো কেন?'

অবাক হলো বনমানুষ। তার ভাষা জানে মানুষটা! 'আমি আকুত। মোলাক মরেছে। এখন আমি রাজা। ভাগো, নইলে খুন করবো।'

'দেখেছো তো, কতো সহজে মেরে ফেলেছি মোলাককে,' বললো টারজান। 'তোমাকেও মারতে পারবো। কিন্তু বনমানুষের রাজা হতে চাই না। আমি শুধু শান্তিতে থাকতে চাই এই বনে। এসো, আমরা বন্ধু হয়ে যাই। তোমাদেরকে সাহায্য করবে টারজান, তোমরাও তাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'আকুতকে মারতে পারবে না তুমি,' জবাব দিলো বনমানুষটা। 'আকুতের মতো বড় কেউ নেই। মোলাককে তুমি না মারলে আকুতই মেরে ফেলতো। রাজা হতো।'

শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না, বোঝা গেল। নিজের গুণগান করতে গিয়ে সতর্কতায় সামান্য ঢিল পড়েছে বনমানুষটার। ঝাঁপ দিলো টারজান।

চোখের পলকে আকুতের একটা বাড়ানো হাত ধরে বাঁকিয়ে নিয়ে এলো পিঠের ওপর। বেমক্কা মোচড় দিয়ে ঠেলা মারলো

সামনে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বনমানুষটা। লাফিয়ে গিয়ে তার পিঠে উঠে পড়লো টারজান। ধরলো মোলাকে যেভাবে ধরেছিলো।

আকুতের গলায় হাতের চাপ বাড়ালো টারজান। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোলো বনমানুষটার গলা থেকে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'কা-গোদা!' বললো টারজান। বনমানুষের ভাষায় এর মানে, আত্মসমর্পণ করো।

মোলাকের গলার হাড় ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দ কানে বাজছে আকুতের। কিন্তু রাজার পদ ছেড়ে দিতে চাইছে না মোটেই। হাত-পা-শরীর নেড়ে মুক্ত করতে চাইলো নিজেকে। পারলো না। গলায় চাপ আরো বাড়লো। শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমতো। কোনোমতে উচ্চারণ করলো, 'কা-গো-দা!'

চাপ সামান্য কমালো টারজান। 'বনমানুষের রাজা তুমিই থাকবে, আকুত। রাজা হবার কোনো ইচ্ছে নেই টারজানের। কিন্তু দরকার পড়লে তোমাদের হয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়বে সে।'

পিঠের ওপর থেকে নেমে এলো টারজান।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো আকুত। ঝাড়া দিলো লম্বাটে মাথাটা। লাল লাল চোখ মেলে টারজানের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় গোঁ গোঁ করে উঠলো একবার। ফিরলো দলের দিকে। বড় আরেক স্বজাতির দিকে চেয়ে লড়াইয়ের আহ্বান জানালো। পিছিয়ে গেল বনমানুষটা। আকুতের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।

একে একে বনের ভেতর গিয়ে ঢুকে পড়লো দলটা।

আবার সৈকতে একা হয়ে গেল টারজান। সাগরের দিকে ফিরলো। চোখ পড়লো বালিতে পড়ে থাকা কাগজটার দিকে। চিঠি। মোলাকের সঙ্গে লড়ার সময় কখন হাত থেকে পড়ে গিয়েছিলো! এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো আবার। ভাঁজ খুললো!

'টারজান,

'বনমানুষের মাঝে বড় হয়েছো তুমি, ওদের মাঝেই মরবে। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে পচাগলা লাশ খাবার সময় ছেলের কথা ভুলে যেও না। ওর পরিণতি হবে তোমার চেয়েও খারাপ।

'বলেছিলাম, প্রতিশোধ নেবো। তাই, তোমার ছেলেকে তুলে দেবো মানুষখেকো জংলীদের হাতে। না না, ওকে খাবে না ওরা, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবো। পেলে-পুষে বড় করার কথাই বলে দেবো ওদেরকে। বড় হয়ে ওদেরই একজন হবে সে, ভয়ংকর মানুষখেকোতে পরিণত হবে।

'কি, ছেলের পরিণতির কথা শুনে খুব খুশি লাগছে না? মানুষের মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তোমার ছেলে, ভাবতে কেমন লাগছে? এটাই তোমার ওপর আমার প্রতিশোধ।—

নিকোলাস রোকোফ।'

পুনশ্চ: তোমার স্ত্রীকেও রেহাই দেবো না। তাকে নিয়ে কি করবো, সেটা আর বললাম না। অনুমান করো নিজেই।

স্তব্ধ হয়ে গেল টারজান। ধারালো ছুরি দিয়ে তার মগজকে কুচি কুচি করে কাটা হচ্ছে যেন। এতো অস্বস্তি জীবনে কখনো বোধ করেনি। ওর···ওর শিশু ছেলেটা শেষ অবধি মানুষখেকোতে পরিণত হবে!···ওর স্ত্রী···আর ভাবতে চাইলো না সে।

ধীরে ধীরে ক্রোধে রূপ নিলো অস্বস্তি, প্রচণ্ড ক্রোধ। কঠিন হলো চোয়াল। বিড়বিড় করলো চাপা গলায়, 'ছেলেকে খুঁজে বের করবোই আমি!'

এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। কাজ করতে হবে তাকে। নইলে স্ত্রী-পুত্রকে উদ্ধার করা যাবে না। এবং সেজন্যে বেঁচে থাকতে হবে। আর এই দুর্গম জঙ্গলে বাঁচতে হলে প্রথমেই দরকার একটা অস্ত্র। বনের ভেতর থেকে ভেসে আসছে চিতার ডাক, সিংহের গর্জন। শুধু হাতে ওই হিংস্র জানোয়ারের দলকে ঠেকাতে পারবে না।

বনে বাস করতে হলে এখানকার আইন মানতেই হবে। একটাই আইন এখানে: হয় মারো, নয় মরো। দিনটা যেভাবেই হোক কাটবে, কিন্তু রাতে? অস্ত্র ছাড়া নিরাপদ বোধ করছে না টারজান। কাজে লেগে পড়লো সে।

ছোটবড় পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সৈকতের এখানে ওখানে। খুঁজতে খুঁজতে চ্যাপ্টা একটুকরো পাথর পেয়ে গেল। ফুটখানেক লম্বা, কোয়ার্টার ইঞ্চি পুরু। বড় একটা পাথরে ঘষে ঘষে একটা ধার পাতলা করে ফেললো। আরো কয়েকবার ঘষা দিতেই ধারালো হয়ে গেল প্রান্তটা।

বনে ঢুকে পড়লো টারজান। গাছের সরু সোজা শুকনো একটা ডাল কাটলো পাথরটা দিয়ে। পড়ে থাকা একটা শুকনো গাছে সরু ছিদ্র করলো একটা। ডালের এক মাথা চোখা করে নিলো। সহজেই ছিদ্রটাতে ঢুকে যায় মাথাটা। কিছু শুকনো ছাল জোগাড় করে ছিদ্রের ওপর রাখলো। চোখা মাথাটা ঢুকিয়ে দিলো ছিদ্রে। ডালের মাঝামাঝি দু'হাতের চেটো দিয়ে চেপে ধরে জোরে জোরে ঘোরাতে লাগলো, ঘুঁটনি দিয়ে যেভাবে ডাল ঘেঁটা হয়, সেভাবে।

হালকা একটা ধোঁয়ার রেখা উঠলো শুকনো ছাল থেকে। ধোঁয়ার পরিমাণ বাড়লো। হঠাৎ জ্বলে উঠলো আগুন। তাতে শুকনো ডালপাতা ফেললো টারজান। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

পাথরটা আগুনে ফেললো। পুড়ে এক সময় লাল হয়ে গেল পাথর। একটা ডাল দিয়ে সেটাকে আগুন থেকে বের করে আনলো তখন। কচি গাছের ছালের রস খুব অল্প অল্প করে ফেললো ধারালো দিকটায়। ছ্যাঁৎ করে রসটুকু খেয়ে নিচ্ছে পাথর। পাথরের অপেক্ষাকৃত নরম কণাগুলো খসে বেরিয়ে চলে এলো। যা রইলো, সেটা হয়ে উঠলো চকচকে।

ঠাণ্ডা হলো পাথর। এবার আসল কাজ। মসৃণ একটা পাথরে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চ্যাপ্টা পাথরের ধারালো দিকটা ঘষতে শুরু করলো। ক্ষুরের মতো ধারালো হয়ে গেল ওটা। তৈরি হয়ে গেল ছুরির ফলা। আগুনে পুড়ে শক্ত করে নিয়েছে, ভাঙবে না আর সহজে। প্রস্তর-যুগের মানুষেরা এ-কায়দায়ই ছুরি বানাতো।

তাড়াহুড়া করলো না টারজান। তাহলে জিনিস ভালো হবে না। ডাল কেটে নিয়ে সুন্দর একটা বাঁট বানালো। তাল জাতীয় গাছের শক্ত পাতলা ছাল দিয়ে পেঁচিয়ে ফলাটা বাঁধলো বাঁটের সঙ্গে। ধনুকের জন্যে সরু চারা গাছ কাটলো। বেশ কিছু তীর বানালো। আর বানালো ভারি দেখে একটা মুগুর।

একটা ঝর্নার ধারে লম্বা একটা গাছ বেছে নিলো টারজান। উঁচু একটা ডালে বেঁধে রাখলো অস্ত্রগুলো। ওই গাছেরই একটা শক্ত তেডালায় মাচা বাঁধলো। চারটে খুঁটি চার কোণায় বসিয়ে তার ওপর দিলো পাতার ছাউনি। তৈরি হয়ে গেল রাত কাটানোর চমৎকার আশ্রয়।

সাঁঝ হয়ে এসেছে। খুব খিদে পেয়েছে। খাবার জোগাড় করা দরকার। টারজান খেয়াল করেছে, ঝরে পড়ে ছোট্ট একটা ডোবা-মতো সৃষ্টি করেছে ঝর্নাটা, তীরে নরম কাদা। তাতে অনেক জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপ। নিয়মিত ওখানে পানি খেতে আসে ওরা।

গাছের ডালে ডালে নিঃশব্দে ওখানে পৌঁছে গেল টারজান। বড় একটা ঝাঁকড়া পাতাঅলা গাছের নিচের দিকে মোটা একটা ডালে এসে নামলো। বসে রইলো লুকিয়ে। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পানি খেতে এলো একটা হরিণ। নিঃশব্দে। টেরই পেলো না, পেছনে অনুসরণ করে আসছে আরেকটা জীব। কিন্তু গাছের ওপর বসা টারজানের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ-

শক্তিকে ফাঁকি দিতে পারলো না জীবটা। এখনো কয়েকশো গজ দূরে রয়েছে। ঝিরঝিরে বাতাসে তার গন্ধ এসে নাকে লাগছে, তীব্র গন্ধ। সিংহ না চিতা বোঝা যাচ্ছে না এখনো।

হরিণটাকেও বেশিক্ষণ ফাঁকি দিতে পারলো না জীবটা। চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো হরিণ। কান খাড়া। ফিরে তাকালো। পরক্ষণেই ঘুরে দিলো দৌড়। ওর ইচ্ছে বুঝতে পারছে টারজান। লাফিয়ে ঝর্না পেরিয়ে ওপারের গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়তে চায়।

তার অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়েছে, বুঝে গেল শিকারী জীবটা। আর লুকিয়ে থাকার কোনো মানে নেই। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এলো সে। সিংহ। একশো গজ দূরেও নেই আর।

সিংহের দিকে চোখ ফেরালো টারজান। ঠিক তার নিচ দিয়েই ছুটে যাবে হরিণটা, বোঝা যাচ্ছে।

ছুটে এলো হরিণ। ঝাঁপ দিলো টারজান। দেরি করা যাবে না মোটেই। তাহলে রাতের খাবারটা খুব ভালোই জমবে সিংহের। হরিণ এবং মানুষ।

হরিণের পিঠে পড়লো টারজান। ওটাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলো হুমড়ি খেয়ে পড়া হরিণের পিঠে। দু'হাতে চেপে ধরলো দুই শিং। একটা মাত্র মোচড় দিয়েই ভেঙে ফেললো ঘাড়ের সরু হাড়।

পেছনে গর্জে উঠলো সিংহ। তার শিকারে ভাগ বসাতে আসে দু'পেয়ে মানুষ! শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেবে! ভীষণ রাগে দ্বিগুণ গতিতে ছুটে আসতে লাগলো সে।

মরা হরিণটাকে কাঁধে নিয়ে লাফ দিলো টারজান। ধরে ফেললো একটা ডাল। এক দোল দিয়েই উঠে বসলো। ঠিক এই সময় পৌঁছে গেল সিংহ। লাফিয়ে উঠে থাবা চালালো। মুহূর্তের ফারাকে ফসকে গেল তার ধারালো নখগুলো।

ধুপপ করে একটা শব্দ হলো নিচে। তাকানোর সময় নেই। টারজান বুঝতে পারলো, শূন্য থেকে মাটিতে পড়েছে জানোয়ারটা। আবার লাফ দিলেই হয়তো ধরে ফেলতে পারবে তাকে। তাড়াতাড়ি ওপরের আরেকটা ডাল ধরে ফেললো সে। চোখের পলকে চলে গেল সিংহের নাগালের বাইরে। নিচে তাকিয়ে মুখ ভেঙচালো।

জ্বলে উঠলো হলুদ চোখজোড়া। রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসতে লাগলো সিংহ।

গাছের ডালে ডালে এগিয়ে চললো টারজান। নিচে অনুসরণ করলো তাকে সিংহটা।

মাচায় উঠে এলো টারজান। ছুরি খুলে নিয়ে কাটলো হরিণটাকে। ঝলসানো বড় এক টুকরো মাংস কেটে নিয়ে খেতে শুরু করলো। নিচে দাঁড়িয়ে তর্জন-গর্জন করছে সিংহ। বৃথাই। গাছে উঠতে পারবে না সে? কিছুই করতে পারবে না বেয়াড়া শাদা জীবটার।

হরিণের প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে ফেললো টারজান। বাকি মাংস গাছের একটা দোডালার মুখে ঝুলিয়ে রাখলো। এখনো রয়েছে সিংহটা। থাক। কিছুই যায় আসে না তার।

শুয়ে পড়লো টারজান।

দুই

আশপাশের জঙ্গল চিনতে আর অস্ত্রশস্ত্র ঠিকঠাক করতেই কেটে গেল পরের কয়েকটা দিন। হরিণের নাড়ি দিয়ে ধনুকে ছিলা লাগালো টারজান। চিতার নাড়ি হলে ভালো হতো, কিন্তু আপাতত কাজ চালাতে হবে। পরে চিতাবাঘ মারতে পারলে তখন অন্য ব্যবস্থা।

ঘাস পাকিয়ে লম্বা শক্ত একটা দড়ি বানালো। খুব কাজে লাগে এই দড়ি, অভিজ্ঞতা আছে টারজানের। অনেক সিংহ মেরেছে দড়ির ফাঁস দিয়ে। কার্চাকের দলে থাকার সময় এই দড়ি দিয়েই শায়েস্তা করেছিলো ভীষণ বদমেজাজী তুবলাতকে।

হরিণের চামড়া দিয়ে ছুরির খাপ আর তূণ বানালো। শহুরে পোশাকের চিহ্নও রাখলো না শরীরে। হরিণের চামড়া কোমরে জড়িয়ে আটকে নিলো চামড়ার বেল্ট দিয়ে। তারপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো একদিন। কোন্ অঞ্চলে এসে পড়েছে, বোঝা দরকার।

সাগর এক পাশে রেখে বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো।

বড় বেশি একাকী মনে হচ্ছে। সঙ্গ চাইছে এখন। অনেক দিন পর আজ মনে পড়লো তার পালক-মা কালার কথা, বনমানুষদের দলের কথা। কোথায় আছে ওরা? সভ্য জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার পর আর খুব একটা দেখা হয়নি ওদের সঙ্গে।

অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে টারজান। কখনো মাটিতে, কখনো ডালে ডালে। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে এক-আধটা পাকা ফল ছিঁড়ে নিয়ে কামড় বসাচ্ছে। এক জায়গায় মরা একটা গাছের নিচ থেকে বের করলো বড় বড় শাদা পোকা। মুখে পুরলো। আরে! আগের মতোই তো ভালো লাগছে খেতে!

আবার এগিয়ে চললো টারজান। মাইলখানেকের বেশি চলে এসেছে মাচা থেকে। এই সময় নাকে এলো চিতাবাঘের গন্ধ।

খুশিই হলো টারজান। একটা চিতাবাঘ তার দরকার। ধনুকের শক্ত ছিলা লাগবে। হরিণের চামড়ায় তূণও খুব একটা ভালো হয় না। কোমরে জড়িয়েও আরাম নেই, মোলায়েম নয় চিতার চামড়ার মতো। নিমেষে অলস ভঙ্গিটা চলে গেল, সতর্ক হয়ে উঠেছে। গাছে উঠে পড়লো।

গাছের ডালে ডালে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো টারজান। মাঝে মাঝেই নাক তুলে বাতাসে গন্ধ শুঁকছে চিতাবাঘের। এগোচ্ছে ঠিক পথেই।

কাছে এসেই বুঝতে পারলো টারজান, শিকারের পেছনে লেগেছে চিতাবাঘ। এক ঝলক বাতাসে ভাটির দিক থেকে ভেসে এলো আরেকটা গন্ধ। বনমানুষ। ওদের ওপরই নিশ্চয় লক্ষ্য বাঘ-

টার। হয়তো বনমানুষের বাচ্চা খাবার লোভ হয়েছে।

আর একটা গাছ পেরিয়েই বাঘটাকে দেখতে পেলো টারজান। বিশাল এক চিতা। গাছে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে। নিচে মাটিতে খানিক দূরে চরছে আকুতের দল। বাচ্চারা খেলছে। মায়েরা খাবার খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা সামলাচ্ছে। পুরুষদের বেশির ভাগই ঢুলছে বসে বসে। বড় একটা গাছের গুঁড়িতে আরাম করে ঠেস দিয়ে বসে আছে আকুত। চোখ বোজা। নিশ্চয় এখনো গন্ধ পায়নি চিতাটার।

বাচ্চাগুলোর দিকে চেয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছে বাঘের। তক্কে তক্কে রয়েছে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কোনো একটা বাচ্চার ঘাড় কামড়ে ধরে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে যাবে গভীর বনে।

অতি সাবধানে এগোলো টারজান। এতোই নিঃশব্দে, ভীষণ সতর্ক চিতাবাঘও টের পেলো না। বাঘটার সঙ্গে একই গাছে উঠে এলো সে। ওটার ওপরের ডালে বসে পড়লো চুপচাপ। আশ্চর্য! একটা পাতা পর্যন্ত নড়লো না! বাঁ হাত ছুরির বাঁটে। দড়ির ফাঁস ব্যবহার করা গেলে, খুব সহজ হয়ে যেতো কাজ। কিন্তু ঘন পাতার জন্যে ঠিকমতো নামানো যাবে না ফাঁস। শব্দ হয়ে যাবার আশংকা আছে। টের পেয়ে যাবে চিতাবাঘ।

মোটা ডালে চুপচাপ হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে জীবটা। অসামান্য ধৈর্য। টারজানের ধৈর্যও তার চেয়ে কম না। সে-ও অপেক্ষা করে আছে চুপচাপ।

খেলতে খেলতে দলছাড়া হয়ে গেল একটা বাচ্চা। রসালো পোকা দেখতে পেয়েছে। টারজান আর চিতাটা যে-গাছে বসে আছে, সেই গাছ বেয়েই উঠছে পোকা। ছুটে এলো বাচ্চাটা।

টানটান হয়ে গেল চিতার শরীর। টারজানেরও। এসে পড়েছে বাচ্চাটা। নিচ দিয়ে যাবার সময় ঝাঁপ দিলো বাঘ। একই সঙ্গে ঝাঁপ দিলো টারজান।

হিংস্র চিৎকারে চমকে গেল বনমানুষেরা। ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো পুরুষগুলো। কিন্তু ওরা ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা। চোখের পলকে।

বিস্মিত আকুত দেখলো, একটা বাচ্চাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছে বিশাল এক চিতা। ওটার ওপর এসে পড়েছে এক শাদা মানুষ—দিন কয়েক আগে মোলাককে মেরেছিলো যে। শূন্যেই বাঘকে ধরে ফেলেছে মানুষটা। গলা জড়িয়ে ধরে জানোয়ারের মতোই দাঁত বসিয়ে দিয়েছে চিতার ঘাড়ে। বাঁ হাতে পাথরের একটা লম্বা কিছু, বসে যাচ্ছে বাঘের একপাশে।

এক লাফে সরে গেল বাচ্চাটা। ঠিক তার পাশেই মাটিতে এসে পড়লো চিতাবাঘ, পিঠে ভারি বোঝা থাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আতংকিত আর্তনাদে রূপ নিয়েছে চিতার হিংস্র চিৎকার। ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে টারজানকে, পারছে না। বার বার সাপের মতো ছোবল হানছে যেন পাথরের ছুরি। চকচকে পিচ্ছিল চামড়া বেয়ে নেমেছে রক্তের ধারা।

গোঙাচ্ছে চিতাটা। নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। আরেকবার

চাপা আর্তনাদ করেই গড়িয়ে পড়ে গেল একপাশে। বার কয়েক খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

নেমে এলো টারজান। মৃতদেহটার ওপর এক পা তুলে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে উঠলো। বিজেতার চিৎকার। কেঁপে উঠলো বনভূমি।

তাজ্জব হয়ে গেছে বনমানুষের দল। অবাক হয়ে একবার তাকাচ্ছে টারজানের দিকে, একবার মাটিতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত চিতার দিকে।

প্রথমে কথা বললো টারজান। একটা বিশেষ ইচ্ছেতেই বাচ্চাটার প্রাণ বাঁচিয়েছে সে। আকুতের দলকে কৃতজ্ঞ করতে চেয়েছে। তবে সেটা মুখে বলে আরো ভালোমতো বুঝিয়ে দেয়া দরকার। মানুষের মতো বুদ্ধি এতো প্রখর নয় ওদের, মগজের জোর অনেক কম। না বললেও যেটা বুঝে যায় মানুষ, বলেও সেটা বনমানুষদের বোঝানো কঠিন।

'আমি বনের রাজা টারজান,' চেঁচিয়ে বললো সে, 'মস্ত শিকারী! মস্ত শিকারী! বিশাল জলার ধারে মোলাককে মেরেছি আমি। আকুতকে ধরেও ছেড়ে দিয়েছি, রাজা হতে চাইনি। এখন তাদের বাচ্চাকে বাঁচিয়েছি। আকুত কিংবা তার দলের কেউ বিপদে পড়লে এভাবে টারজানকে ডাকতে হবে,' বলে মুখের ওপর দু'হাত এনে জোরে অদ্ভুত একটা শব্দ করলো। 'এবং, তারা যখন টারজানের ডাক শুনতে পাবে, তাকে সাহায্য করতে ছুটে যেতে হবে। বুঝতে পারলে কিছু?'

'হাহ্!' জবাব দিলো আকুত।

'হাহ্!' বলে উঠলো অন্য যোদ্ধারা।

যেন কিছুই ঘটেনি, এমনি ভাবসাব, আবার খাবার খোঁজায় মন দিলো বনমানুষেরা। পুরুষগুলো আর দিবানিদ্রা দিতে গেল না। তাদেরও খিদে পেয়েছে। খাবার খুঁজতে লাগলো। ওদের সঙ্গে যোগ দিলো টারজান, ওরফে জন ক্লেটন, ওরফে লর্ড গ্রেস্টোক।

আকুত এখন টারজানের কাছাকাছি থাকতে চাইছে। খেতে খেতে মাঝেমাঝেই কুৎকুতে লাল চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছে আজব শাদা মানুষটাকে, তার দু'চোখে শ্রদ্ধা। একবার এমন একটা কাজ করে বসলো, অ্যানথ্রপয়ডরা যা কখনো করে না, অন্তত টারজান দেখেনি। রসালো একটা খাবার তুলে নিজে না খেয়ে তাকে দিয়ে দিলো আকুত।

কালচে-বাদামী রোমশ দেহগুলোর মাঝে বড় বেমানান লাগছে ধবধবে শাদা টারজানকে। অথচ তাদেরই একজন হয়ে গেছে এখন সে। খাবার খোঁজার সময় গায়ে গা ঠেকে যাচ্ছে, খেয়ালই করছে না বনমানুষেরা। টারজানের উপস্থিতি মোটেই অস্বস্তিকর ঠেকছে না ওদের কাছে। তবে ঠিক বন্ধুও ভাবতে পারছে না এখনো। আকুতকে যেমন করে, টারজানকেও তেমনি ভয় করছে ওরা।

বাচ্চাকোলে কোনো বনমানবীর কাছাকাছি গেলেই গর্জে উঠছে মা। দাঁত খিঁচিয়ে হুমকি দিচ্ছে টারজানকে। খাবার তুলে মুখে পোরার সময় কারো কাছাকাছি হলে, পুরুষগুলোও গর্জে উঠছে। এটা অ্যানথ্রপয়ড সমাজের নিয়ম। এতে অভ্যস্ত টারজান। কিছুই

মনে করছে না সে। বরং তাড়াতাড়ি সরে আসছে সেসব জায়গা থেকে।

মানুষের পূর্বপুরুষদের মাঝে বেশ শান্তিতে রয়েছে টারজান। নিঃসঙ্গ বোধ করছে না মোটেই। বরং তার আদিম জঙ্গল-জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছে আবার, রোমাঞ্চ অনুভব করছে পুরোনো দিনগুলোর মতোই, যখন বনমানুষদের মাঝে থাকতো।

পরের পুরো হপ্তাটা বনমানুষদের সঙ্গে কাটিয়ে দিলো টারজান। ওরা এখন বন্ধু ভাবতে শুরু করেছে তাকে। না, স্ত্রী-পুত্রের কথা ভুলে যায়নি সে। বিশেষ কারণেই আকুতের দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছে। অতীতের অনেক ঘটনা, অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে, এরকম একটা দলকে সহকারী হিসেবে পেলে, অনেক কাজে লাগে। অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। ঘেজি পর্বতমালায় ভয়াবহ এক ডাকাতের দলকেই ধ্বংস করে দিয়েছিলো একদল বেবুনের সাহায্যে (টারজান-৩, 'হারানো সাম্রাজ্য' দ্রষ্টব্য)।

আকুতের দলের সঙ্গে ভাব হয়ে যাবার পর, কিছুদিনের জন্যে সরে এলো টারজান। কেমন জায়গায় তাকে ফেলে গেছে রোকোফ, দেখা বাকি। অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি।

এক সকালে আবার বেরিয়ে পড়লো টারজান। সাগরকে পাশে রেখে রওনা হলো উত্তরে। সারাটা দিনই প্রায় একনাগাড়ে চললো। থামলো রাতের বেলা। একটা হরিণ মেরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো গাছের ডালে।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার পর পরই গাছ থেকে নেমে পড়লো

টারজান। বেরিয়ে এলো সৈকতে। সামনে সাগর। সূর্য রয়েছে ডানে। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়! তারমানে সাগরকে পাশে রেখে এখন হাঁটলে উত্তরে না এগিয়ে পশ্চিমে এগোবে!

ব্যাপারটা নিয়ে আপাতত বেশি ভাবনা-চিন্তা করলো না টারজান। খেয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো। সারাটা দিন হাঁটলো। থামলো সূর্য ডোবার আগে।

আশ্চর্য! সূর্য কি তার চিরাচরিত নিয়ম পাল্টে ফেললো! উত্তরে ডুবছে! সাগরের দিকের দিগন্তে! হঠাৎই নির্মম সত্যটা উপলব্ধি করতে পারলো টারজান। না, সূর্য তার নিয়ম ঠিকই মানছে। পশ্চিমেই ডুবছে। এর মানে একটাই। কোনো দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে গেছে তাকে রোকোফ!

এটাই স্বাভাবিক, ভাবলো টারজান। পরিচিত অঞ্চলে তাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে, রোকোফের মতো শত্রুর কাছে সেটা আশা করে না সে। শাস্তি দেবার জন্যেই নির্বাসন দিয়ে গেছে এই নির্জন দ্বীপে, চিরদিনের জন্যে।

নিশ্চয় মূল ভূখণ্ডের দিকে গেছে রোকোফ। আফ্রিকার গহন কোনো জঙ্গলে, যেখানে বাস করে মানুষখেকো জংলী মানুষ। জ্যাককে তুলে দেবে ওদের হাতে। ছেলের পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠলো টারজান। মানুষখেকো জ্যাক! পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে ধারালো করে তোলা দাঁত, চোখা নাক, শাদা মুখে বিচিত্র রঙের বিদঘুটে আঁকিবুকি! না না, এ হতে পারে না!

গুঙিয়ে উঠলো টারজান। দু'হাতে তার গলা টিপে ধরেছে যেন

রোকোফ !

আর জেন ?

জেনের কি পরিণতি হবে ? কতোখানি মানসিক অশান্তিতে রয়েছে বেচারী ? জানে না তার ছেলে কোথায়, স্বামী কোথায় ! ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে, এটাও হয়তো জানে না। বলবে না রোকোফ, ইচ্ছে করেই···

ভাবতে ভাবতে জঙ্গলের দিকে চললো টারজান। থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। নিমেষে উধাও হয়ে গেল ভাবনা। অদ্ভুত একটা শব্দ কানে আসছে। অচেনা। কেমন যেন আঁচড়ের শব্দ !

সতর্ক হয়ে উঠলো ও। এগিয়ে চললো আবার। বনে এসে ঢুকলো। শব্দ লক্ষ্য করে শিগগিরই এসে দাঁড়ালো বড় একটা গাছের কাছে। ঝড়েই হয়তো মাটিতে পড়ে গেছে গাছটা, তার তলায় চাপা পড়ে আছে বিরাট এক কালো চিতাবাঘ, শীতা।

মোটা একটা ডালের নিচে রয়েছে শীতার কোমর। পেছনে যেতে পারছে না, সামনেও এগোতে পারছে না। কেউ সাহায্য না করলে মুক্তি পাবে না আর।

তূণে হাত দিলো টারজান। কাঁধ থেকে খুলে আনলো ধনুক। তীর পরালো। তিলে তিলে ধুঁকে মরার চেয়ে এইই ভালো। তীর ছুঁড়তে গিয়েও থমকে গেল। মারতেই হবে কেন প্রাণীটাকে ? দেখে মনে হচ্ছে, মেরুদণ্ড ভাঙেনি। পায়ের হাড়ও ঠিকঠাকই আছে। গাছের নিচ থেকে ওকে বের করে দিলেই তো হয় ?

আবার তীরটা তূণে রেখে দিলো টারজান। ধনুক রাখলো কাঁধে।

আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল শীতার কাছে।

নিচু ঘড়ঘড় শব্দ করতে লাগলো টারজান, গলার ভেতর থেকে বেরোচ্ছে চাপা আওয়াজ। বন্ধুর সঙ্গে এভাবেই মনের ভাব প্রকাশ করে চিতারা, যখন খোশমেজাজ থাকে।

গোঙানি থামিয়ে দিলো চিতাটা। মাটি আঁচড়ানো বন্ধ। সবুজ দুই চোখে বিস্ময়। চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে।

ওপর থেকে গাছ সরাতে হলে শীতার একেবারে কাছে গিয়ে বসতে হবে টারজানকে, মারাত্মক নখগুলোর আওতার মধ্যে। গাছটা ঠেলে তোলামাত্র বেরিয়ে যাবে চিতাবাঘ, চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়তো টারজানের ওপর। এক থাবায় ফাঁসিয়ে দেবে পেট। এতোখানি ঝুঁকি নেয়া কি উচিত হবে?

কিন্তু আর কোনো উপায় নেই। ঝুঁকি না নিলে বাঁচানো যাবে না বাঘটাকে। এগিয়ে গেল টারজান। চাপা ঘড়ঘড় শব্দ করেই চলেছে।

আজব শাদা মানুষটার ওপর চোখ, ধীরে ধীরে একপাশে ঘুরে যাচ্ছে শীতার মাথা। বেরিয়ে পড়েছে ভীষণ দাঁতগুলো। হুমকির ভঙ্গি নয়, তবে বিঁধিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত।

চিতাটার পাশে গিয়ে বসে পড়লো টারজান। এক কাঁধ ঢুকিয়ে দিলো মোটা একটা ডালের তলায়। চাপ দিলো ওপরের দিকে। এক হাঁটু গিয়ে ঠেকলো শীতার কালো চকচকে চামড়ায়। ইচ্ছে করলেই এখন উরু চিরে ফালাফালা করে দিতে পারে চিতাবাঘ।

শক্তিশালী পেশীগুলো শক্ত হতে লাগলো, চাপ বাড়তে লাগলো

ডালের তলায়, আরো···আরো···

অতি ধীরে উঠতে লাগলো গাছটা। এক ইঞ্চি···দুই ইঞ্চি··· তিন···পিছলে গাছের নিচ থেকে বেরিয়ে চলে এলো শীতা। ঘুরলো সঙ্গে সঙ্গেই। টারজানের মুখোমুখি। এখনো কাঁধ থেকে ড'ল সরায়নি টারজান।

হাসি ফুটলো জঙ্গল-মানবের মুখে। অদ্ভুত হাসি। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চিতাটার দিকে। গলা থেকে বেরোচ্ছে এখনো ঘড়ঘড় শব্দ। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে গাছ নামানো চলবে না। চিতাটাকে চমকে দেয়া চলবে না কিছুতেই। আক্রমণ করে বসতে পারে।

ধীরে, অতি ধীরে আবার গাছটাকে নামিয়ে রাখলো টারজান। আস্তে করে বেরিয়ে এলো ডালের তলা থেকে। উঠে দাঁড়ালো। মুখোমুখি দুই দানব। একের চোখ অন্যের চোখে নিবদ্ধ। মাঝখানের ফারাক বড়জোর তিন পা।

ইচ্ছে করলে এক লাফে মরা গাছটায় উঠে দাঁড়াতে পারে এখন টারজান। তারপর লাফিয়ে উঠে চলে যেতে পারে কোনো গাছে, শীতার নাগালের বাইরে। কিন্তু কি ভেবে তা সে করলো না। বরং পা বাড়ালো সামনে।

ঝট করে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল শীতা। ভয়ংকর হাঁ-করা চোয়ালের মাত্র ফুটখানেক দূর দিয়ে হেঁটে চলে গেল টারজান। পেছনে ফিরে তাকালো না একবারও।

এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো চিতা। তারপর হাঁটতে শুরু করলো। অনুসরণ করে চললো মানুষটাকে, শিকারী কুকুরের

মতো।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে এগিয়ে গেল টারজান। তাকালো না পেছনে। টের পাচ্ছে, ঠিক পেছনেই রয়েছে শীতা। কৃতজ্ঞতা? নাকি শিকারকে চোখে চোখে রাখছে? খিদে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে! বোঝা যাচ্ছে না এখনো কিছুই। চিতার মতো হিংস্র আর স্বাধীনচেতা জানোয়ারের ব্যাপারে সঠিকভাবে বলা যায় না কিছুই।

সাঁঝ হলো। খিদে পেয়েছে। একটা কিছু শিকার করা দরকার। একটা জলাশয়ের কাছে চলে এলো টারজান। হরিণের অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে রইলো গাছের ডালে।

শীতাকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় কোনো ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে আছে।

এলো হরিণটা। নিচ দিয়ে যাবার সময় দাড়ির ফাঁসে আটকে ফেললো টারজান। মাটিতে নেমে এসে ঘড় ঘড় আওয়াজ করে ডাকলো শীতাকে। জোড়ায় জোড়ায় শিকার করে চিতাবাঘ, শিকারের ওপর দাঁড়িয়ে এমনি করেই ডাকে সঙ্গীকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো শীতা। মৃত রক্তাক্ত হরিণটাকে দেখে তীক্ষ্ণ এক ধরনের শব্দ করে উঠলো। খুশি হয়েছে সে, বুঝিয়ে দিলো হাবভাবে। একই সঙ্গে শিকারকে খেতে শুরু করে দিলো দুই বন্য প্রাণী।

পরের কয়েকটা দিন একই সঙ্গে রইলো ওরা। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালো। শীতা শিকার ধরলে টারজানকে ভাগ দেয়, টার-

খান শিকার করলে ডাকে চিতাটাকে।

একদিন একটা বুনো শুয়োর মেরেছে শীতা। খাচ্ছে টারজানকে নিয়ে। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ ওখানে এসে হাজির এক সিংহ। সেই যে, যার হরিণ কেড়ে খেয়েছিলো টারজান।

থমকে দাঁড়ালো সিংহ। একটা মুহূর্ত। তারপরই প্রচণ্ড গর্জন করে উঠে তেড়ে এলো।

এক লাফে পাশের ঝোপে গিয়ে ঢুকে পড়লো শীতা।

লাফিয়ে মাথার ওপরের একটা ডাল ধরে ফেললো টারজান। উঠে পড়লো গাছে।

ওপরে তাকিয়ে বার দুই ধমক দিলো টারজানকে সিংহ। তারপর মহানন্দে খেতে শুরু করলো শুয়োরের মাংস। খাওয়ায় এতোই মনোযোগ, ধীরে ধীরে নেমে আসছে দড়ির ফাঁস, খেয়ালই করলো না।

সিংহের মাথা গলিয়ে ফাঁসটা গলায় নিয়ে এলো টারজান। হ্যাঁচকা এক টান দিতেই শক্ত হয়ে এঁটে গেল ফাঁস। এমন বিপদে জন্মেও পড়েনি সিংহ। গর্জে উঠলো। থাবা দিয়ে ধরতে চেষ্টা করলো দড়িটা, পারলো না।

টেনে সিংহকে তুলে ফেলতে লাগলো টারজান। মোটা এক ডালের সঙ্গে বেঁধে ফেললো দড়িটা। অসহায় পশুরাজ। দড়িতে ঝুলছে। পেছনের পা শুধু ঠেকে আছে মাটিতে। শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমতো। হাঁকডাকও বন্ধ। থাবা দুটো নিষ্ফল আক্রোশে বাতাস কাটছে শুধু।

লাফিয়ে গাছ থেকে নেমে এলো টারজান। ডাকলো শীতাকে। বিচিত্র শব্দ আর ইঙ্গিত করে কিছু বোঝালো চিতাটাকে। কোমরের খাপ থেকে খুলে নিলো পাথরের ছুরি। তারপর একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা অসহায় সিংহের ওপর, দু'পাশ থেকে।

থাবা মেরে সিংহের একপাশ চিরে ফালা ফালা করে ফেলছে শীতা। আরেক পাশে ছোবল হানছে টারজানের ছুরি। বিচিত্র দৃশ্য। বাধা দেবার সামান্যতম উপায়ও নেই পশুরাজের, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

দুই বিজেতার চিৎকারে কেঁপে উঠলো আকাশ-বাতাস। একজনের মোটা ভারি গলা, আরেকটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ। আতংকে স্তব্ধ হয়ে গেল যেন পুরো বন।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল এক সময় শব্দের রেশ।

ঠিক সেই সময় তীরে নেমেছে একদল মানুষ। কয়লার মতো কালো চামড়া। মুখে, শরীরে বিচিত্র রঙে নানারকম আঁকিবুকি কাটা। যোদ্ধার সাজে সজ্জিত। ক্যানোটাকে তীরে টেনে তোলা হয়েছে। দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। কান খাড়া। অদ্ভুত সেই চিৎকার শুনে বিস্মিত, হতভম্ব।

তিন

শীতাকে নিয়ে বনমানুষদের কাছে এলো টারজান।

বিশাল কালো চিতাবাঘটাকে দেখে চমকে গেল আকুত আর তার দল। দ্রুত পিছিয়ে গেল। পালাবে। ডেকে ওদের ফেরালো টারজান। নতুন একটা পরীক্ষা করতে চায়। দেখবে, হিংস্র চিতা আর বনমানুষের মাঝে ভাব করানো যায় কিনা।

বনমানুষের নিজস্ব ভাষা আছে। ওদেরকে কথা বোঝানো যায়। কিন্তু চিতাবাঘের কোনো ভাষা নেই, আছে কিছু শব্দ। ওগুলো ব্যবহার করে সূক্ষ্ম কোনো ব্যাপার শীতাকে বোঝানো প্রায় অসম্ভব, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে চায় টারজান।

কথা শোনাতে হলে প্রথমেই পোষ মানিয়ে নিতে হবে চিতা-টাকে ; বোঝাতে হবে, টারজানই তার প্রভু।

বনমানুষদের দিকে চেয়ে ভেঙচি কাটছে শীতা। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ভয় দেখাচ্ছে ওদেরকে। ধমক দিলো টারজান। শুনলো না চিতা। চট করে দড়ির ফাঁস ওর গলায় আটকে দিলো সে। তারপর মুগুর দিয়ে নাকেমুখে কষে লাগালো এক ঘা। ব্যথায়

আর্তনাদ করে উঠলো শীতা। টারজানকে আক্রমণের চেষ্টা করলো। আবার খেলো মুগুরের বাড়ি। দমাদম শীতাকে পিটিয়ে চললো টারজান। শেষে একেবারে শুয়ে পড়লো চিতাটা।

ব্যস, হয়েছে। এরপর কথা না শুনলে শুধু মুগুর তুললেই হবে। ফাঁস খুলে আনলো টারজান। তার প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে চিতাবাঘ।

সে রাতটা বনমানুষদের মাঝেই কাটিয়ে দিলো টারজান আর শীতা।

পরদিন খাবার খুঁজতে বেরোলো ওরা। মানুষ, চিতা আর বনমানুষের এক বিচিত্র দল। দলপতি, টারজান। সারাটা দিন বনে বনে ঘুরে বেড়ালো ওরা। বিশেষ গোলমাল বাধালো না একে অন্যের সঙ্গে। বেয়াড়াপনা কেউই করলো না, তা নয়। তবে টারজানের মুগুরের আচ্ছামতো পিটুনি খেয়ে মেজাজ শরীফ হয়ে গেল আবার সঙ্গে সঙ্গেই।

সে-রাতটাও একসঙ্গেই কাটালো ওরা। শীতা আর বনমানুষদের মাঝে বন্ধুত্ব হয়নি এখনো, এড়িয়ে চলছে। তবে একে অন্যকে দেখলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে না আর।

পরদিন। সকাল সকালই আবার খাবারের সন্ধানে বেরোলো দলটা। দুপুরের একটু আগে দল থেকে সরে এলো টারজান। সৈকতে বেরিয়ে এলো। গাছের ছায়ায় বালিতে শুয়ে তাকিয়ে রইলো সাগরের দিকে। ভাবছে, কি করে বেরোবে এই দ্বীপ থেকে? একটা নৌকা বানিয়ে নেয়া গেলে হয়তো বেরোনো যেতো। কিন্তু বানাবে কি দিয়ে? প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, মাল-

মশলা নেই। তাহলে কি চিরদিন এই দ্বীপেই থেকে যেতে হবে তাকে? কোনোদিনই আর বেরোতে পারবে না? উদ্ধার করতে পারবে না স্ত্রী-পুত্রকে? যতোই দিন যাচ্ছে, বাড়ছেই হতাশা।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে টারজান। খেয়ালই করলো না, লম্বা ঘাসবনের ভেতর থেকে তাকে দেখছে কয়েকজোড়া চোখ। বিস্মিত।

বাতাসের উজানে রয়েছে টারজান। তাই ওদের গন্ধ নাকে এলো না তার।

ঘাসবনের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করলো ওরা। কাছাকাছি এসে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে উঠলো একসঙ্গে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো টারজান। ঘুরে তাকিয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একদল জংলী। কুচকুচে কালো চামড়া। গায়ে-মুখে বিচিত্র আঁকিবুকি। মাথায় পাখির পালক গোঁজা।

হাতের মুগুর ঘুরিয়ে ছুটে এলো জংলীরা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল টারজানের শরীরে। থাবা মেরে প্রথম জংলীটার হাত থেকে মুগুর কেড়ে নিয়েই বসিয়ে দিলো মাথায়। চোখের পলকে ধরাশায়ী হলো লোকটা। হৈ-হৈ করে ঘিরে ধরলো অন্যেরা। কিন্তু ধারেকাছে ঘেঁষতে পারলো না টারজানের। মুগুরের প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো একের পর এক। পিছিয়ে গেল ওরা। ঘাসবনে ঢুকে মুগুর ফেলে দিয়ে বল্লম তুলে নিলো হাতে। এগিয়ে এলো আবার।

জংলীদের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে টারজান। বুকের

ওপর ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত। মুখে অদ্ভুত হাসি। তার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা।

নিচু গলায় নিজেদের মাঝে কি আলোচনা করে নিলো জংলীরা। আবার তাকালো শাদা মানুষটার দিকে। দুদিক থেকে এগিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ফেলতে শুরু করলো তাকে।

পেছনে সাগর। সামনে জঙ্গল। কোনোদিকেই যেতে পারবে না টারজান। পথ রুদ্ধ। বনের দিকে ছুট লাগাতে পারে, কিন্তু লাভ হবে না। তার আগেই উড়ে আসবে অসংখ্য বল্লম, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে।

এখনো খানিকটা দূরে রয়েছে জংলীরা। দাঁড়িয়ে পড়লো হঠাৎ। চেঁচিয়ে উঠলো ওদের সর্দার। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধনাচ। হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে বিচিত্র নাচ নেচে নেচে বল্লম তুলে এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে।

হঠাৎ মুখের ওপর দু'হাত তুলে আনলো টারজান। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো। এতোই ভয়াবহ সে শব্দ, চমকে থেমে গেল যোদ্ধারা। তাজ্জব হয়ে গেছে। চাওয়া-চাওয়ি শুরু করে দিলো নিজেরা নিজেরা। এমন শব্দ জীবনে শোনেনি। কোনো মানুষের গলা থেকে এমন আওয়াজ বেরোতে পারে! বিশ্বাস করতে পারছে না যেন! অথচ চোখের সামনে দেখতে পেলো, ঠোঁট নড়ে উঠলো আজব শাদা মানুষটার। ওর গলা থেকেই বেরিয়েছে শব্দটা, কোনো সন্দেহ নেই।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলো ওরা। তারপরই আবার শুরু হয়ে গেল

লাফঝাঁপ। বল্লম তুলে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসতে শুরু করলো।

ঝড় উঠলো যেন বনের ভেতর। প্রচণ্ড শব্দ। ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়া হচ্ছে ঝোপঝাড়, গাছপালা। আবার থেমে গেল জংলীরা। কিসের শব্দ, দেখার জন্যে ফিরে তাকালো। খানিক পরেই এমন এক দৃশ্য দেখলো, বরফের মতো জমে গেল যেন সবাই।

ঘন লতানো ঝোপের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক কালো চিতা। ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে সবুজ চোখ। মুখব্যাদান করে আছে, বেরিয়ে পড়েছে ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ দাঁত। টকটকে লাল জিভ, লালা গড়াচ্ছে। ভয়ংকর চেহারা। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

চিতাটার পরপরই বেরিয়ে আসতে লাগলো গরিলার মতো দেখতে কতগুলো জীব। কালচে-বাদামী রোমশ দেহ। গরিলার মতোই চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ছোটে। কুৎসিত বিকট চেহারা।

টারজানের ডাকে সাড়া দিয়েছে তার জানোয়ার বন্ধুরা। সাহায্য করতে ছুটে এসেছে আকুতের দল আর শীতা।

বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারলো না জংলীরা, তার আগেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো জানোয়ারের দল। আরেকদিক থেকে এগিয়ে এলো টারজান।

শুরু হয়ে গেল লড়াই।

একনাগাড়ে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে চলেছে জংলীরা। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছেনা বিচিত্র শত্রু-

দের সঙ্গে।

শীতার হিংস্র নিষ্ঠুর দাঁত আর নখ কেটে ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিচ্ছে কালো দেহগুলোকে। আকুতের হলুদ চোখা দাঁত ছিঁড়ে ফেলছে গলার রক্তনাহী শিরা, একের পর এক। অন্যান্য বনমানুষও প্রাণপণে লড়ছে। তার ওপর রয়েছে টারজানের ভয়ানক ছুরি।

শিগগিরই যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলো জংলীরা। পালাতে শুরু করলো যে যেদিকে পারলো। পেছনে তাড়া করে গেল ভয়ানক জানোয়ারের দল। ঘাসবন পেরোনোর আগেই ধরা পড়ে গেল কালোরা, মারা পড়তে লাগলো পাইকারী হারে।

দিশেহারা হয়ে পড়লো জংলীদের সর্দার। ঘাসবনের দিকে গেল না। ছুটলো ঘন ঝোপের উদ্দেশে।

ফিরে এলো শীতা। দলবল নিয়ে ফিরে এলো আকুত। শাদা বালিতে বিছিয়ে আছে কালো রক্তাক্ত দেহগুলো। মহানন্দে ভোজনে লেগে গেল বিজেতারা।

সর্দার কোন দিকে গেছে, খেয়াল রেখেছে টারজান। শীতা আর বনমানুষদেরকে খাওয়ায় লেগে যেতে বলে লোকটার পিছু ধাওয়া করলো সে।

বনের ভেতরে পড়িমড়ি করে ছুটছে সর্দার। পেছনে টারজান। ছুটতে ছুটতেই সর্দার মোড় নিলো সৈকতের দিকে।

গাছের আড়াল থেকে দেখলো টারজান, একটা নৌকা, যুদ্ধ ক্যানো, ডাঙায় তোলা। ওটার দিকেই ছুটেছে লোকটা।

ফিরে তাকালো একবার সর্দার। পেছনে শাদা মানুষটাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো আতংকে। বাড়িয়ে দিলো ছোটার গতি।

কাঁধের ওপর এসে পড়লো কঠিন একটা থাবা। আত্মরক্ষার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো সর্দার। কিন্তু কিছু করার আগেই ভয়ংকর এক ঘুসি এসে পড়লো মুখে। উড়ে গিয়ে বালিতে চিত হয়ে পড়লো সে।

কথা বলে উঠলো টারজান, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের জংলীদের ভাষায়, 'কে তুমি?'

'মুগাম্বি, ওয়াগাম্বিদের সর্দার!' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো লোকটা। হাতজোড় করলো। 'আমাকে··· আমাকে মেরো না!'

'ছেড়ে দিতে পারি,' বললো টারজান, 'এক শর্তে। আমাকে সাগর পাড়ি দিতে সাহায্য করতে হবে। ·· কি হলো চুপ করে আছো কেন?'

'করবো,' কাঁপা কাঁপা গলা মুগাম্বির। 'কিন্তু,আমার সব যোদ্ধাদের মেরে ফেলেছো। একা কি পারবো আমি? দাঁড় টানার লোক নেই, হাল ধরার কেউ নেই, কি করে পাড়ি দেবো এতোবড় জলা?'

লোকটার দিকে চেয়ে ভাবছে টারজান। প্রায় তারই মতো লম্বাচওড়া, চমৎকার স্বাস্থ্য। বললো, 'সেটা আমি বুঝবো। এসো আমার সঙ্গে।'

যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবার কথা ভেবে ভয়ে ঝুঁকড়ে গেল মুগাম্বি। ওখানে রয়েছে একদল ভয়ংকর জানোয়ার। তার সঙ্গীদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে এখন। তাকেও ছেড়ে দেবে না ধরতে পারলে।

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে, পিছিয়ে গেল। খপ করে তার হাত চেপে ধরলো টারজান।

'আমাকে···আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে···' মুগাম্বির কণ্ঠে আতংক।

'না,' বললো টারজান, 'ছিঁড়বে না। ওরা আমার কথা শোনে।'

তবু দ্বিধা গেল না মুগাম্বির। বনমানুষের দল আর শীতার ভয়ংকর চেহারা বার বার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। কিছুতেই যেতে চাইলো না সে যুদ্ধক্ষেত্রে। অবশেষে জোর খাটাতে হলো টারজানকে। লোকটাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো।

খাবারে ব্যস্ত জানোয়ারগুলো। টারজান আর মুগাম্বিকে দেখে মুখ তুলে তাকালো। চাপা গলায় গজরাতে লাগলো কেউ কেউ। ওদের মাঝেই সর্দারকে টেনে নিয়ে এলো টারজান।

এগিয়ে এলো আকুত আর তার দলের কয়েকজন। কুৎকুতে চোখ মেলে তাকালো মুগাম্বির দিকে। চোখে সন্দেহ। টারজানের আদেশে অবশেষে মেনে নিলো কালো মানুষটার উপস্থিতি, শীতাকে যেমন মেনে নিয়েছে। আবার গিয়ে মন দিলো যার যার খাওয়ায়।

উঠে এলো শীতা। ভরপেট খেয়েছে। মুগাম্বির চারপাশে চক্কর দিতে লাগলো ধীরে ধীরে, চাপা গলায় গর্জাচ্ছে, চোখে সন্দেহ।

টারজানকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে মুগাম্বি। আতংকিত চোখে চেয়ে আছে চিতাবাঘটার দিকে।

মুগাম্বির অবস্থা দেখে হেসে ফেললো টারজান। শীতার ঘাড়ের

চামড়া খামচে ধরে টেনে আনলো। থাবা মারলো নাকেমুখে। চুপ হয়ে গেল চিতা। পরক্ষণেই আবার গর্জে উঠলো। আবার থাবা খেলো নাকেমুখে। এভাবে কয়েকবার থাবা খেয়েই ঠিক হয়ে গেল। মেনে নিতে বাধ্য হলো মুগাম্বির উপস্থিতি।

খালি হাতে ভয়ানক এক জানোয়ারকে থাবা মারছে এক মানুষ, দেখে, তাজ্জব হয়ে গেছে মুগাম্বি। কোটর ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ। আজব শাদা মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে এলো মাথা। দেবতা ভেবে বসলো টারজানকে।

মুগাম্বির ওপর সন্দেহ গেল না শীতার। তবে এগোলো না আর। খানিক দূরে বালিতে শুয়ে পড়লো। চোখ এদিকে।

সময় গেল।

তার সঙ্গে অনেক সহজ হয়ে এসেছে শীতা আর বনমানুষেরা, তবু সন্দেহ পুরোপুরি গেল না মুগাম্বির। কোনো একটা জানোয়ার বেশি কাছাকাছি হয়ে গেলেই ভয় পেয়ে যায় সে। তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখে, আশেপাশে আছে কিনা টারজান।

দিন যায়। ধীরে ধীরে আরো সহজ হয়ে এলো ওরা একে অন্যের সঙ্গে। একই সঙ্গে খাবারের খোঁজে বেরোয় এখন। শিকার করে।

একদিন। পাহাড়ের ধারে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে চার শিকারী : টারজান, মুগাম্বি, শীতা আর আকুত। এই সময় তাদের সামনে এসে পড়লো একটা হরিণ। গর্জে উঠে লাফিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। ধরে ফেললো

হরিণটাকে। মুগাম্বির ধারণা, টারজান ওটার ঘাড় না মটকালেও চলতো, আতংকেই মরে যেতো প্রাণীটা।

আগুন ধরালো মুগাম্বি। কেটে কেটে যার যার মাংস আলাদা করে দিলো টারজান। খেতে বসে গেল একসঙ্গে। একমাত্র মুগাম্বিই সামান্য একটু ঝলসে নিলো মাংস। অন্যেরা কাঁচাই খেতে লাগলো।

নৌকা পাওয়া গেছে, সাগর পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু মাঝিমাল্লা নেই! ভেবে ভেবে এক বুদ্ধি বের করলো টারজান। বনমানুষের দলকে কাজে লাগাবে! লেগে পড়লো কাজে। নৌকাটাকে তুলে এনে ফেললো ছোটো একটা খাঁড়িতে। পানি অগভীর। বনমানুষদেরকে একজন একজন করে তুলে নিতে লাগলো ক্যানোতে, দাঁড় তুলে দিলো হাতে। তারপর নিজে বেয়ে দেখিয়ে দিলো, কি করে বাইতে হয়।

অনুকরণই সার হলো, বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না বনমানুষেরা, একমাত্র আকুত ছাড়া। জেদ চেপে গেল টারজানের। আকুত যদি পেরে থাকে, অন্যেরা পারবে না কেন?

দিনের পর দিন হপ্তার পর হপ্তা পেরিয়ে গেল। চেষ্টা চালিয়ে গেল টারজান। সফল হলো অবশেষে। দাঁড় বাওয়া অনেকখানি রপ্ত করে নিয়েছে কয়েকটা পুরুষ বনমানুষ। এইবার বেরিয়ে পড়া যায়।

মুগাম্বির কাছে জানতে পারলো টারজান, এখান থেকে মূল ভূখণ্ড খুব বেশি দূরে নয়। প্রায়ই শিকারে বেরোয় ওয়াগাম্বি উপ-

জাতির লোকেরা। নৌকা নিয়ে চলে যায় দূর দূরান্তের দ্বীপে। আশেপাশে আরো অনেক দ্বীপ আছে, ওগুলোতেও আসে ওরা। সর্দার আরো জানালো, চওড়া উগাম্বি নদীর ওপারে তাদের গাঁ। পাহাড়ের পাদদেশে।

বেরিয়ে পড়ার কথা বললো টারজান।

সন্দেহ প্রকাশ করলো মুগাম্বি। 'ওই বানরের দলকে নিয়ে সাগর পাড়ি দেবো-! নির্ঘাৎ ডুবে মরবো, বাওয়ানা!'

'এখানে থাকলে মরবো না, ঠিক! কিন্তু ঝুঁকি না নিলে কোনোদিনই বেরোতে পারবো না এ-দ্বীপ থেকে। কোনো জাহাজই আসে না এদিকে।'

চুপ করে গেল মুগাম্বি।

একদিন সকালে, অনুকূল বাতাস দেখে যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলো টারজান। পাল টানালো মুগাম্বি।

সাগরে ভাসলো নৌকা। এগিয়ে চললো তরতর করে। ক্যাপ্টেন টারজানের প্রধান সহকারী ওয়াগাম্বিদের সর্দার মুগাম্বি। প্রহরী, শীতা। হাল ধরলো আকুত। মাঝিমাল্লা বারোটা পুরুষ বনমানুষ। বিচিত্র এক নাবিক দল নিয়ে শুরু হলো নিরুদ্দেশ যাত্রা।

চার

খোলা সাগরে এসে পড়েছে ক্যানো।

বড় বড় ঢেউ। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দুলছে নৌকা। টারজান আর মুগাম্বিও দাঁড় তুলে নিয়েছে। খালি বনমানুষদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে ভরসা পাচ্ছে না। পশ্চিমা বায়ু এসে ধাক্কা দিচ্ছে পালে। ভালোই এগোচ্ছে ক্যানোটা।

পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে পড়ে আছে শীতা। চিতাটাকে কাছাকাছি রাখছে টারজান। দলের অন্যদের কাছে গেলে কখন আবার কোন বিপদ ঘটিয়ে বসবে, কে জানে! কোনো কারণে ক্ষেপে গিয়ে বনমানুষদের কারো ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেই সর্বনাশ! কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

এক গলুইয়ের কাছে টারজান, অন্য গলুইয়ে মুগাম্বি। সর্দারের সামনেই বসেছে আকুত। পুরো নৌকাটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে বারোটা বনমানুষ। কুৎকুতে চোখ মেলে দিগন্ত দেখছে, দেখছে সাগরের পানি। থেকে থেকেই পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে। চোখে বুভুক্ষা নিয়ে দেখছে প্রিয় বনভূমিকে, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূর

থেকে দূরে।

হঠাৎ গতি বদলে গেল বাতাসের। ঝুলে পড়লো পাল। খানিক পরেই দ্বিগুণ বেগে এসে পালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এলো-মেলো হাওয়া, চরকির মতো পাক খেতে শুরু করলো নৌকাটা।

আতংকিত হয়ে পড়লো এক ডজন যাত্রী। গুঙিয়ে উঠলো, চাপা গলায় গজরাতে শুরু করলো কেউ কেউ। পানিকে ওদের দারুণ ভয়, নইলে এতোক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়তো সাগরে। বনমানুষদের গোলমাল থামাতে বেশ বেগ পেতে হলো আকুতকে। মেরে ধরে অনেক কষ্টে শান্ত করলো ওদেরকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিলো শীতা, জোরে থাবা মেরে আবার তাকে শুইয়ে দিয়েছে টারজান। পালের দড়িতে ঢিল দিয়ে, টান করে, হালটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে কোনোমতে নৌকার চক্কর থামালো মুগাম্বি।

শিগগিরই ঠিক হয়ে গেল বাতাসের গতি। সহজ ভাবে এগিয়ে চললো আবার নৌকা। এরপর আর কোনোরকম গোলমাল হলো না।

একনাগাড়ে ঘণ্টা দশেক চললো নৌকা। দূরে, দিগন্তে দেখা গেল কালো ছায়া, ডাঙার রেখা। বিকেল হয়ে গেছে। সাঁঝের আগে ওখানে পৌছানো যাবে কিনা, কে জানে! মাঝিদেরকে আরো তাড়াতাড়ি দাঁড় বাওয়ার নির্দেশ দিলো টারজান।

তীরের বালিতে ঘ্যাঁচ করে এসে ঠেকলো নৌকার তলা। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সৈকতে। ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে গেল নৌকা। ভয় পেয়ে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে ওটাকে

ডুবিয়েই দিলো আকুতের দল। গায়ের ওপর এসে পড়ছে ঢেউ। আতংকে চেঁচাতে চেঁচাতে তীরে এসে উঠলো বনমানুষের দল। চিতাটা আগেই উঠে পড়েছে।

বড় এক ঢেউ ক্যানোটাকে ভাসিয়ে এনে তীরে আছড়ে ফেললো। যে কটা সম্ভব, দাঁড় উদ্ধার করলো টারজান আর মুগাম্বি।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। পানিতে ভিজে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে থরথর করে কাঁপছে আকুত আর তার দল। আগুন জ্বালিয়ে নিলো মুগাম্বি। সে-ই কেবল এসে বসলো আগুনের ধারে।

পুরো দলটাতে রাত্রিকে ভয় পায় না শুধু টারজান আর শীতা। ঘন অন্ধকার জঙ্গলে এসে ঢুকলো ওরা শিকার খুঁজতে।

কখনো পাশাপাশি, কখনো আগেপিছে হাঁটছে। সতর্ক। গন্ধটা প্রথম পেলো টারজান। মোষ।

গন্ধ শুঁকে শুঁকে একটা জলাভূমির ধারে চলে এলো ওরা। তীরে ঘন নলখাগড়ার ঝাড়। ঝাড়ের কাছেই কাদাপানিতে জানোয়ারটাকে দেখা গেল। বিরাট মদ্দা মোষ।

বাতাসের ভাটিতে রয়েছে শিকারীরা। তাদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে না মোষটা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। সাবধানে এগোলো দুই শিকারী।

অনেকদিন থেকেই একসঙ্গে রয়েছে ওরা, একে অন্যের ইঙ্গিত বুঝতে পারে। চাপা গলায় মৃদু গররর করে শীতাকে ইঙ্গিত দিলো টারজান। সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠলো চিতা। গিয়ে পড়লো মোষের পিঠে। নখ বসিয়ে দিলো মাংসে। কামড়ে ধরলো

ঘাড়ের কাছটা।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলো মোষ, হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ালো। ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো চিতাটাকে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে টারজান। মোষের ঘাড়ের ঘন রোম খামচে ধরে গলায় ছুরির খোঁচা মারতে লাগলো বারবার। প্রধান রক্তবাহী-শিরা কেটে দিতে চাইছে।

গম্ভীর আর্তনাদ করে উঠে ঘুরলো মোষ। পিঠেই রয়েছে চিতা। ঘাড়ের রোম ধরে ঝুলছে টারজান। সেই অবস্থায়ই ছুটলো বিশাল জীবটা। প্রায় দু'শো গজ বয়ে নিয়ে চলে এলো দুই শত্রুকে, শুক-নোয়। আবার ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো পিঠের ভারি জীবটাকে। পারলো না। অসংখ্য ক্ষত দিয়ে রক্তের ধারা বইছে। কাহিল হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ টারজানের ছুরি আঘাত হানলো বিরাট হৃৎপিণ্ডটাতে। ভোঁতা একটা শব্দ তুলেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল মোষ।

মোষের পেট মাটি ছোঁয়ার আগেই সরে দাঁড়িয়েছে টারজান। লাফিয়ে পিঠ থেকে নেমে পড়েছে শীতা।

পাশাপাশি বসে মোষের কাঁচা মাংস খেয়ে পেট ভরালো। তার-পর কাছেই একটা ঝোপের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লো শীতা। তার পেটের ওপর মাথা রেখে শুলো টারজান। ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরের আলো ফোটার আগেই উঠে পড়লো ওরা। আবার খেলো মোষের মাংস। তারপর রওনা হলো সৈকতে।

দলের অন্যদেরকে নিয়ে এলো। সবাই মিলে খেয়ে শেষ করে

ফেললো আস্ত মোষটাকে। শীতে ক্ষুধায় সারারাত ঘুমাতে পারেনি আকুতের দল। পেট ভরেছে এখন, আলোও ফুটছে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো ওরা। শীতাও শুয়ে পড়লো বনমানুষদের কাছাকাছি।

মুগাম্বিকে নিয়ে বেরোলো টারজান। উগাম্বি নদী খুঁজে বের করতে হবে।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বড়জোর শ'খানেক গজ এগিয়েই নদীর পাড়ে পৌঁছে গেল ওরা। দেখামাত্রই চিনলো মুগাম্বি। জানালো, এই নদী ধরেই সাগরে চলে গিয়েছিলো ওরা ক্যানো নিয়ে।

স্রোত দেখেই বোঝা যায়, নদীর কোন দিকটা সাগরে গিয়ে পড়েছে। তীর ধরে হেঁটে চললো দুজনে। পৌঁছে গেল মোহনার কাছে। মোড় নিয়ে সৈকত ধরে আরো মাইলখানেক এগিয়ে পৌঁছুলো সে জায়গাটায়, যেখানে নেমেছিলো গত সন্ধ্যায়। তীরের বালিতে তেমনি পড়ে রয়েছে ক্যানো।

টেনে-হিঁচড়ে পানিতে নৌকা নামালো দুজনে। দুটো দাঁড় তুলে নিলো হাতে, বাকিগুলো ফেলে রাখলো পাটাতনে।

চলে এলো ওরা মোহনার কাছে। তীব্র স্রোত ঠেলে নৌকা ঢুকিয়ে নিলো নদীতে। উজান বেয়ে চললো। একমাত্র অমানুষিক শক্তির কারণেই নৌকাটা নিয়ে এগোতে পারছে ওরা কোনোমতে।

ঘন বনের বুক চিরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে পাহাড়ী নদী। আশার সঞ্চার হলো টারজানের মনে। এসব নদী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তার। নদীর তীরে জংলীদের গ্রাম থাকবেই। যতোই

গভীরে যাবে, শুরু হবে মানুষখেকোদের গ্রাম। ওকে যে দ্বীপে নামিয়ে দিয়েছিলো রোকোফ, সেটা থেকে এই জায়গাটা বেশি দূরে নয়। খুব বেশি দূরে যাবার চেষ্টা করবেও না সে। এদিকেই নিশ্চয় কোথাও নামিয়ে দিয়ে গেছে জ্যাককে।

প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে নৌকা ভেড়ালো ওরা। পানির ওপর নুয়ে পড়া একটা গাছের ডালে ক্যানোটাকে বাঁধলো টারজান। তারপর লাফিয়ে নেমে এলো দুজনে ডাঙায়। বিকেল হয়ে গেছে তখন।

যেখানে রেখে গিয়েছিলো, সেখানেই পাওয়া গেল আকুতের দলকে। উত্তেজিত। আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না শীতাকে। কারণ জিজ্ঞেস করলো টারজান।

আকুত জানালো, ঘুম থেকে উঠেই দেখছে, দলের দুজন বনমানুষ অদৃশ্য। শীতাও নেই।

গেল কোথায় ওরা! শীতার ব্যাপারে ভাবনা নেই টারজানের। বনের কোথাও নিশ্চয় গেছে সঙ্গীর খোঁজে। কিন্তু বনমানুষদুটো গেল কোথায়? পালালো? সাঁঝ হয়ে এসেছে। এখন আর খুঁজতে যাবার সময় নেই। সকালে দেখা যাবে।

নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা। ভোরে উঠে পড়লো টারজান। ডেকে তুললো দলের সবাইকে। তখনো দেখা নেই শীতা আর দুজন বনমানুষের।

আকুতের দলকে নিয়ে নদীর দিকে এগোলো টারজান আর মুগাম্বি। চলতে চলতেই তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠলো টারজান। পর পর

দু'বার। দূর থেকে ভেসে এলো জবাব। খানিক পরেই পাশের ঝোপ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো শীতা।

বনমানুষ দুজনের কোনো খবর নেই। চেঁচিয়ে কয়েকবার ইঙ্গিত করলো টারজান। কোনো জবাব এলো না। বোঝা গেল, ওরা পালিয়েছে।

আরো ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলো টারজান। চেঁচিয়ে ডাকলো। কিন্তু সাড়া এলো না পলাতকদের কাছ থেকে। স্বেচ্ছায় না আসতে চাইলে জোর করে এনে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হবে। তাই আর দেরি করতে চাইলো না সে। নৌকায় উঠে পড়ার আদেশ দিলো দলটাকে।

সবার আগে উঠে গেল মুগাম্বি। তারপর একে একে উঠলো আকুত আর তার দল। টারজানের পায়ে গা ঘষছে শীতা, নৌকার দিকে চেয়ে মৃদু গরগর করছে। আস্তে করে তার পিঠে চাপড় দিলো টারজান। লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়লো চিতাটা। আগের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লো গুটিশুটি হয়ে। টারজানও উঠলো।

যার যার জায়গায় বসে পড়েছে মাল্লারা। দাঁড় তুলে নিয়েছে হাতে। ছেড়ে দেয়া হলো নৌকা। উজান বেয়ে এগিয়ে চললো ওরা।

দুপুরের আগে নৌকা তীরে ভেড়ানোর আদেশ দিলো টারজান। খিদে পেয়েছে সবারই। খাওয়া দরকার।

শিকারে বেরিয়েছে এক কাফ্রী।

হৈ-চৈ শুনে নদীর ধারে চলে এলো লোকটা। গাছের আড়াল থেকে দেখলো টারজানকে। শীতা আর বনমানুষেরা আগেই ঢুকে গেছে বনে। মুগাম্বির পেছনটা দেখতে পেলো শুধু সে।

আর দেখার অপেক্ষা করলো না শিকারী। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছুলো গ্রামে। নদীর কয়েক মাইল উজানে কাফ্রী-দের এই গ্রাম।

গোলাকার কুঁড়ের আঙিনায় বসে আছে সর্দার। তার সামনে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো শিকারী, 'আরেকজন আসছে··· শাদা মানুষ!···সঙ্গে অনেক যোদ্ধা! সেই কালোদাড়িওলা শাদা মানুষটার মতোই বিশাল এক যুদ্ধ-ক্যানোতে করে আসছে ওরা!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সর্দার কাভিরি। শাদা মানুষের শয়-তানী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সে মাত্র এই কিছু দিন আগে, এরই মাঝে আরেকজন! ঘৃণায় মুখ বাঁকালো সে। যোদ্ধাদের খবর পাঠানোর আদেশ দিলো।

বেজে উঠলো ঢাক। দলে দলে এসে সর্দারে আঙিনায় জমায়েত হতে লাগলো কালো যোদ্ধারা। যারা বনের ভেতরে শিকারে গিয়েছিলো, সংকেত পেয়ে তারাও এলো ছুটতে ছুটতে।

দ্রুত সাজানো হলো সাতটা যুদ্ধ-ক্যানো। হৈ-হৈ করে গিয়ে নৌকায় উঠলো যোদ্ধারা। হাতে লম্বা বল্লম, চকচকে ফলা। প্রায় নিঃশব্দে ভাটির দিকে এগিয়ে চললো ক্যানোগুলো।

তীব্র স্রোত। দাঁড় বাইতে হলো না। এমনিতেই হু-হু করে ছুটে চললো নৌকা। শুধু হাল ধরে বসে রইলো প্রতিটি ক্যানোতে

একজন করে মাঝি।

নদীর একটা বাঁক ঘুরেই শত্রুপক্ষের ক্যানোটা দেখতে পেলো ওরা। মুখ ফিরিয়ে তাকালো একটা কুৎসিত জীব। চাপা গর্জন করে উঠলো।

চমকে উঠলো জংলীরা। এমন অদ্ভুত জীব এর আগে কখনো দেখেনি ওরা। ধরেই নিলো, শাদা মানুষের নৌকায় ওগুলো প্রেতাত্মা, কিংবা শয়তানের চেলা। চেঁচিয়ে উঠে টপাটপ নদীতে লাফিয়ে পড়তে লাগলো যোদ্ধারা। সাঁতরে তীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলে। একমাত্র কাভিরির ক্যানোটা থেকেই কেউ পালালো না, সর্দারের ভয়ে।

গায়ে গায়ে এসে ঠেকলো দুটো নৌকা। প্রথমেই লাফিয়ে এসে কাভিরির নৌকায় পড়লো শীতা। এক যোদ্ধাকে চিত করে পাটাতনে ফেলে দাঁত বসিয়ে দিলো গলায়। তার পর পরই এসে নামলো আকুত। একটা কাফ্রীকে দু'হাতে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো পানিতে। টপাটপ লাফিয়ে এসে পড়তে লাগলো বনমানুষেরা। মুগাম্বি নামলো, এক যোদ্ধার হাত থেকে কেড়ে নিলো বল্লম। আক্রমণ করলো। সব শেষে ছুরি হাতে এসে পড়লো টারজান।

বাধা দেবার সুযোগ পাচ্ছে না কাভিরির যোদ্ধারা। নিহত হচ্ছে একের পর এক। কাভিরিকে ধরলো টারজান, বিশালদেহী লোকটার গলা টিপে ধরে শূন্যে তুলে ফেললো, যেন একটা পুতুল। দম বন্ধ হয়ে গিয়ে চোখে আঁধার দেখলো সর্দার। জ্ঞান হারালো।

জ্ঞান ফিরলে দেখলো সর্দার, ক্যানোর পাটাতনে পড়ে আছে।

যোদ্ধাদের কেউ নেই। দাঁড় বাইছে ভয়ংকর দর্শন একদল জীব। পাটাতনে তার পাশেই শুয়ে আছে বিশাল এক কালো চিতাবাঘ, সবুজ জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকেই দেখছে। গলুইয়ে বসে আছে শাদা মানুষটা। মানুষ নয়, যেন এক দানব। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো কাভিরির।

ধরেই নিলো সর্দার, এইবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে চিতাটা। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো সে।

কিছুক্ষণ পরও যখন গলায় ভয়ানক খদন্ত বিঁধলো না, ভয়ে ভয়েই আবার চোখ মেললো কাভিরি। আগের জায়গাতেই রয়েছে চিতাটা। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো লক্ষণ নেই। জন্তুটার ওপাশে গলুইয়ে বসে মিটিমিটি হাসছে শাদা দানব।

ফিরে তাকালো কাভিরি। আরেক গলুইয়ে বসে আছে তারই মতো একজন কালো মানুষ। সর্দারের দিকে তাকালোই না সে। নীরবে দাঁড় বেয়ে চলেছে।

'কি নাম তোমার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো টারজান।

ফিরে চাইলো লোকটা। 'আমি···আমি সর্দার কাভিরি।'

'আক্রমণ করলে কেন? আমরা তো লড়াই করতে আসিনি।'

'তিন চাঁদ আগে আরো একজন শাদা মানুষ এসেছিলো,' বললো কাভিরি। 'বলেছিলো, শান্তিতে থাকতে এসেছে। ওর সঙ্গে লড়াই করিনি আমরা। বরং দুধ আর ছাগলের মাংস উপহার পাঠিয়েছি। তীরে নামলো লোকটা দলবল নিয়ে। তারপর হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো আগুন-লাঠি নিয়ে। মেরে-ধরে শেষ করলো

আমার লোকদের। লুঠপাট চালালো। গাঁয়ের যুবক-যুবতীদের ধরে নিয়ে চলে গেল।'

'আমি ওর মতো নই,' বললো টারজান। 'আগে আক্রমণ না করলে তোমাদেরকে ছুঁতামও না। আচ্ছা, ওই খারাপ শাদা মানুষটা দেখতে কেমন ছিলো? আমি একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হয়তো ওই লোকটাই সে।'

'চেহারা দেখলেই ভয় লাগে। কালো দাড়ি। চাহনিটা খুব খারাপ, হ্যাঁ, খুব খারাপ! যেন নরকের শয়তান!'

'ওর সঙ্গে কি কোনো শাদা বাচ্চা ছিলো?' দুরুদুরু বুকে কাভিরির জবাবের অপেক্ষা করছে টারজান।

'না, বাওয়ানা,' এদিক ওদিক মাথা দোলালো সর্দার। 'ওর সঙ্গে ছিলো না, তবে অন্য দলটার কাছে ছিলো।'

'অন্য দল? কোন দল?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো টারজান।

'যে দলের পিছু নিয়েছিলো খারাপ শাদা মানুষটা। আগের দলটাতেও ছিলো একজন শাদা মানুষ, একজন শাদা মেয়েমানুষ, একটা শাদা বাচ্চা আর ছয়টা কালো মসুলা কুলি। খারাপ মানুষ-টার তিন দিন আগে এই নদীর ধার ধরে গিয়েছিলো দলটা। মনে হচ্ছিলো, কোনো কারণে পালাচ্ছে। বোধহয় খারাপ মানুষটার ভয়েই।'

শাদা মানুষ, মেয়েমানুষ এবং বাচ্চা! অবাক হয়ে ভাবছে টার-জান। বাচ্চাটা জ্যাক, কিন্তু মানুষটা কে? আর মেয়েমানুষটা? রোকোফের দলে কি মেয়েমানুষ ছিলো? হয়তো কোনো পুরুষের

সঙ্গে যোগসাজশ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মেয়েটা। জ্যাককে রোকোফের কাছ থেকে নিয়ে পালিয়েছে। হয়তো, শহরে ফিরে গিয়ে জেনের কাছে টাকা দাবি করার জন্যেই করেছে এ-কাজ।

কিন্তু ওরা পালাতে পারবে না। পিছু নিয়েছে রোকোফ। নদীর উজান ধরে গভীর জঙ্গলে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। যতোই এগোবে, বাড়বে হিংস্র জন্তুজানোয়ারের সংখ্যা, গিয়ে পড়বে ভয়ানক মানুষ-খেকোদের অঞ্চলে।

উজান বেয়ে এগিয়ে চলেছে ক্যানো। কাভিরির গাঁয়ের কাছে এসে তীরে ভেড়ানো হলো। প্রথমেই নেমে গেল শীতা। তার-পর একে একে নামলো আকুতের দল। নৌকাটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধলো কাভিরি। তারপর সবাইকে নিয়ে গাঁয়ে এসে ঢুকলো।

বিচিত্র দলটাকে দেখে আঁতকে উঠলো গাঁয়ের লোক। পালাতে শুরু করলো। ডেকে ওদের ফেরালো কাভিরি।

কাভিরির কুঁড়ের সামনে আঙিনায় বসলো অতিথিরা। খাবার এনে দেয়া হলো ওদের।

খাওয়া-দাওয়া শেষে কাভিরিকে বারোজন লোক দিতে বললো টারজান। নদীর যতোই উজানে যাবে, স্রোত বাড়বেই। বড় ক্যানোটাকে দাঁড় বেয়ে নিয়ে যেতে হলে লোক দরকার।

টারজান যা বলবে, তাতেই রাজি এখন কাভিরি। ভয়ংকর দলটাকে কোনোমতে গ্রাম থেকে সরাতে পারলে বাঁচে।

কাভিরি লোক দিতে রাজি হলো বটে, কিন্তু লোকেরা রাজি

হলো না সঙ্গে যেতো। একে একে কেটে পড়তে লাগলো দর্শকরা আঙিনা থেকে। বনে গিয়ে ঢুকলো। অবশেষে আঙিনায় একমাত্র কাভিরিই রইলো, তার গাঁয়ের আর সবাই পালিয়েছে।

হাসি চাপলো টারজান। 'যেতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে না ওদেরকে। তুমি এখানেই থাকো, কাভিরি। শিগগিরই এসে পড়বে ওরা।' রহস্যময় শোনালো তার গলা।

উঠলো টারজান। মুগাম্বিকে কাভিরির কাছে রেখে দলবল নিয়ে চলে গেল বনের দিকে।

আধ ঘন্টা ধরে বনের দিক থেকে ভেসে এলো শুধু পাখি, জন্তু-জানোয়ার আর পোকামাকড়ের স্বাভাবিক ডাক। চুপচাপ বসে আছে কাভিরি আর মুগাম্বি, পাশাপাশি। অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ বন থেকে ভেসে এলো ভীষণ শব্দ। আঁতকে উঠলো কাভিরি। তার মনে হলো, শয়তানের নাচন শুরু হয়েছে বনের ভেতরে। বনমানুষের ভোঁতা গর্জন, চিতার তীক্ষ্ণ শিস আর আতংকিত মানুষের চিৎকার, সব মিলিয়ে এক রোমহর্ষক অবস্থা।

পাঁচ

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে কাভিরির। মুগাম্বির দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বললো, 'কিসের শব্দ!'

মুচকি হাসলো মুগাম্বি। 'বাওয়ানা টারজান আর তার দল। ঠিক কি করছে, জানি না। তবে তোমার লোকেরা যারা পালাতে চেষ্টা করবে, মরবে।'

কেঁপে উঠলো কাভিরি। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ। চিরকাল বনে বাস করে এসেছে, অনেক আজব, অনেক ভয়ংকর জিনিস দেখেছে, কিন্তু এমন কাণ্ড জীবনে দেখেনি। এমন অদ্ভুত শব্দও শোনেনি আর কখনো।

কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে শব্দ। শোনা যাচ্ছে মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চার আতংকিত হট্টগোল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো কাভিরি। ছুটে পালাতে যাবে, খপ করে তার হাত চেপে ধরলো মুগাম্বি। তার ওপর টারজানের আদেশ, সর্দার পালাতে চেষ্টা করলেই যেন আটকায়।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো কালোরা। ছুটে

এসে জড়ো হচ্ছে আঙিনায়। থরথর করে কাঁপছে। মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে পারে। তিন দিক থেকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেরিয়ে এলো বনমানুষের দল। এক প্রান্তে টারজান, অন্য প্রান্তে আকুত। মাঝামাঝি জায়গায় শীতা।

লম্বা লম্বা পা ফেলে কাভিরির সামনে এসে দাঁড়ালো টারজান। ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'তোমার লোকেরা এসেছে, কাভিরি। কাকে কাকে নেবো, পছন্দ করে দাও।'

কাঁপতে কাঁপতে পা বাড়ালো কাভিরি। আঙুল তুলে একজন একজন করে দেখিয়ে নাম ধরে ডাকলো। কিন্তু এগিয়ে এলো না ওরা, যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। বরং পিছিয়ে গেল দু'একজন।

'ওদেরকে বলো,' গম্ভীর হয়ে বললো টারজান, 'যে কথা শুনবে না, চিতার পেটে যাবে। জিজ্ঞেস করো, বনমানুষদের লেলিয়ে দেবো কিনা।'

আদেশ পালন করলো কাভিরি।

আর দ্বিধা করলো না কাফ্রীরা। নাম ধরে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে দাঁড়ালো সামনে। বারোজন লোককে পছন্দ করে দিলো সর্দার।

ভয়ে কাঁপছে লোকগুলো। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। বার বার আতংকিত চোখে তাকাচ্ছে শীতা আর বনমানুষদের দিকে।

কাভিরি অভয় দিলো, কথা শুনলে বাওয়ানা টারজান তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু ভয় কাটলো না লোকগুলোর।

বিষণ্ণ মুখে রওনা হলো ঘাটের দিকে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে। এখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে আদেশ কার্যকর করতে।

একে একে ক্যানোতে এসে উঠলো দলটা। নৌকা ছাড়ার আদেশ দিলো টারজান। উজান বেয়ে এগিয়ে চললো আবার ক্যানো। কুমিরে বোঝাই নদী। উজানের দিকে হিংস্র জীবগুলোর সংখ্যা খুব বেশি। জলহস্তীও দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে।

পরের তিনটে দিন একনাগাড়ে এগোলো ওরা। ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝে পালিয়েছে বারোজনের তিনজন। দিনে দু'বার করে তীরে নামতে হয়, খাবার জন্যে। তখনই পালিয়েছে লোকগুলো।

দুর্গম জঙ্গল। টারজান আর শীতার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নৌকার চেয়ে দ্রুত এগোতে পারবে ওরা। অসুবিধে বনমানুষদের নিয়ে। অপরিচিত জায়গায় অস্বস্তি বোধ করে ওরা। তাছাড়া একনাগাড়ে অনেকক্ষণ চলতেও অভ্যস্ত নয়। বাধ্য হয়েই নৌকা নিয়ে উজান ঠেলতে হচ্ছে টারজানকে।

দিনের বেলা নৌকা থামিয়ে জঙ্গলে শিকার টরে, রাতে নদীর বুকে জেগে থাকা অসংখ্য ছোটো ছোটো দ্বীপের কোনো একটার গায়ে নৌকা ভিড়িয়ে রাত কাটায়। এভাবেই চলছে। নদীর দু'-তীরেই জংলীদের গ্রাম। কিন্তু কোথাও লোক দেখা গেল না। কাভিরির গ্রাম থেকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে খবর, ক্যানোতে করে ভয়ংকর এক পিশাচের দল আসছে। ফলে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গেছে গ্রামবাসীরা।

লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে খবরও পাওয়া যাবে না। অবশেষে ঠিক করলো টারজান, জঙ্গলের ভেতর দিয়েই এগোবে সে। নৌকার ভার থাকবে মুগাম্বির ওপর।

মুগাম্বি রাজি হলো। নিজের দল ঠিক রাখার কড়া আদেশ হলো আকুতের ওপর।

'দিন কয়েক পরেই আবার দেখা হবে,' নামার আগে মুগাম্বিকে বললো টারজান। 'লোকেরা পালিয়ে যাবার আগেই গিয়ে কোনো গাঁয়ে ঢুকবো। খারাপ শাদা মানুষটার খবর জানতে হবে।'

লাফ দিয়ে তীরে নেমে চোখের পলকে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল টারজান।

সামনে, প্রথম কয়েকটা গ্রাম খালি। খবর পেয়ে গেছে লোকেরা, পালিয়েছে। বিকেলের দিকে আরেকটা গ্রাম দেখতে পেলো টারজান। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে পাতার গোল গোল কুঁড়ে। গাছের ডালে ডালে এগিয়ে চললো সে।

গাঁয়ের ধারে বড় একটা গাছের ওপর এসে থামলো টারজান। পাতার আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে পুরো গ্রামটা। বেরোনোর একটামাত্র ফটক, বাঁশ দিয়ে তৈরি। রুদ্ধ। সব মিলিয়ে শ'দুয়েক হবে অধিবাসীদের সংখ্যা। সান্ধ্য আহারে বসেছে ওরা। রাত নামার আগেই খেয়ে-দেয়ে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেবে।

হঠাৎ সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ভড়কে যেতে পারে জংলীরা। বলা যায় না, শড়কি বল্লম নিয়ে তেড়েও আসতে পারে। আপাতত

লড়াই করার কোনো ইচ্ছে নেই টারজানের। খবর সংগ্রহ করতে চায় সে। ভেবেচিন্তে একটা ফন্দি বের করলো।

গাছের আরো ওপরের একটা ডালে উঠে গেল টারজান। ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে চিতার ডাক ডেকে উঠলো। বাঘটা যেন খুবই ক্ষুধার্ত, খাবার খুঁজছে। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো, ঝট করে এক সঙ্গে চোখ তুলে তাকিয়েছে গাঁয়ের লোক। ওদের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাজে লাগবে ফন্দিটা।

ইতিমধ্যেই অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। ঘন পাতার আড়ালে বসা টারজানকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

আবার চিতার ডাক ডেকে উঠলো টারজান। আরো জোরে, আরো তীক্ষ্ণ, আরো ভয়াবহ আওয়াজ। তারপর একটাও পাতা না নেড়ে প্রায় নিঃশব্দে নেমে এলো মাটিতে। হরিণের গতিতে ছুটে এসে দাঁড়ালো ফটকের সামনে। পাল্লায় থাবা দিয়ে চেঁচিয়ে বললো, সে একজন মানুষ, খাবার এবং রাতের আশ্রয় চায়।

মানুষ বললেই কি আর বিশ্বাস করে জংলীরা? খানিক আগে চিতার ডাক শুনেছে গাছের ওপর, তারপর বন্ধ দরজায় আঘাত, এখন কথা বলছে মানুষের গলায়, খাবার আর আশ্রয় চাইছে। ওদিকে নামছে রাত। না, সাড়া দেয়া যায় না কিছুতেই। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে যার যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো জংলীরা। শয়তান না অপদেবতা, কে জানে! কে যায় অপঘাতে মরতে!

মুচকি হাসলো টারজান। চেঁচিয়ে বললো, 'ভয় পেয়ো না,

আমি বন্ধু। শাদা মানুষ। খারাপ শাদা মানুষটার খোঁজে এসেছি। তোমাদের অনেক ক্ষতি করেছে ও, শুনেছি। ওকে শাস্তি দেবো আমি।'

জবাব নেই।

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না, বুঝতে পারছি,' আবার বললো টারজান। 'ঠিক আছে, প্রমাণ করে দিচ্ছি, আমি বন্ধু। গাছের ওপর থেকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দেবো চিতাটাকে। এরপর যদি আমাকে ঢুকতে না দাও, ওটাকে ডেকে আনবো আবার। তোমাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

আবার নীরবতা। কয়েক মুহূর্ত পর বড় একটা কুঁড়ের ভেতর থেকে ভেসে এলো বুড়ো মানুষের গলা, 'সত্যিই যদি শাদা মানুষ হও, বন্ধু হও, ঢুকতে দেবো তোমাকে। তাড়িয়ে দিয়ে এসো শয়তান চিতাটাকে।'

'বেশ,' জবাব দিলো টারজান। 'কান পেতে থাকো। চিতাটাকে তাড়াতে যাচ্ছি আমি।'

দ্রুত আবার এসে সেই গাছটায় উঠে পড়লো টারজান। জোরে জোরে ঝাঁকালো ডালপাতা, সে যে উঠেছে, এটা বোঝালো জংলীদের। একই সঙ্গে গর্জে উঠলো চিতার গলায়।

খেকিয়ে উঠলো টারজান, চিতাটাকে ধমক লাগালো যেন। তারপর আরো জোরে জোরে নাড়তে শুরু করলে ডালা। লড়াই বেধেছে যেন দুই ভয়ানক জীবের মাঝে। একবার গর্জে উঠছে চিতার গলা নকল করে, একবার ধমকে উঠছে মানুষের ভাষায়।

সে এক মহা তুলকালাম।

গাছটার অন্য পাশে চলে এলো টারজান। খানিকটা পিছিয়ে গেছে যেন চিতা। চেঁচামেচি করতে করতে লাফিয়ে চলে এলো আরেক গাছে, তারপর আরেক গাছে। ঢুকে যেতে থাকলো বনের ভেতরে। তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে চিতাবাঘকে।

অনেকখানি ভেতরে এসে থামলো টারজান। তারপর ফিরে চললো আবার। নিঃশব্দে নামলো গাছ থেকে। বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালো। ধাক্কা দিয়ে বললো, 'বাঘটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছি। এবার দরজা খোলো।'

চাপা উত্তেজিত গলায় আলাপ-আলোচনা চলছে কুঁড়ের ভেতর, কানে আসছে টারজানের। তারপর ধীরে ধীরে খুলে গেল কুঁড়ের দরজা। বল্লম হাতে বেরিয়ে এলো বারোজন যোদ্ধা। ভয়ে ভয়ে এসে খুলে দিলো ফটক।

প্রায় উলঙ্গ বিশালদেহী শাদা একজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল জংলীদের।

নরম গলায় ওদেরকে অভয় দিলো টারজান। ঢুকে পড়লো ভেতরে।

চট করে আবার ফটক লাগিয়ে দিলো যোদ্ধারা। শক্ত করে আটকে দিয়ে হাঁপ ছাড়লো। টারজানকে ঘিরে এগিয়ে নিয়ে এলো সর্দারের কুঁড়ের সামনে। ডাকলো।

বেরিয়ে এলো সর্দার। তারপর পিলপিল করে কুঁড়েগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো নারী-পুরুষ-বাচ্চা। সবাই এসে ঘিরে

দাঁড়ালো টারজানকে। ভীত কৌতূহলী চোখ মেলে দেখছে।

সর্দারের কাছে জানতে পারলো টারজান, খারাপ শাদা মানুষটা এক হপ্তা আগে গেছে এখান দিয়ে। সে সময় শিং গজাতে শুরু করেছে তার, সঙ্গে নিয়ে গেছে এক হাজার অপদেবতাকে। হাসি চাপলো টারজান। জংলীদের গালগল্পের বহর জানা আছে তার। বানিয়ে বলে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে সর্দার।

শাদা মানুষটা গেছে এদিক দিয়েই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারমানে ঠিক পথেই এগোচ্ছে, টারজান। অনেক এগিয়ে এসেছে, অচিরেই ধরে ফেলতে পারবে রোকোফকে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলো টারজান, রোকোফের আগে আরেকটা দল গেছে। কাভিরির কথার সঙ্গে মিলে গেল এই সর্দারের কথা।

টারজান জানালো, ক্যানো নিয়ে তার দলের অন্যেরা আসছে নদীপথে। ওদেরকে দেখে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। কোনো খারাপ আচরণ না করলে, ঠিকঠাক মতো খাবার সরবরাহ করলে, কিচ্ছু বলবে না ওরা। কি ধরনের যাত্রী আসছে, তারও একটা বর্ণনা দিলো টারজান। শেষে বললো, 'এখন, আমাকে খাবার দাও। খেয়েদেয়ে গিয়ে ওই গাছটার তলায় ঘুমিয়ে পড়বো। কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

একটা কুঁড়ে খালি করে দিতে চাইলো সর্দার, কিন্তু তাতে থাকতে রাজি হলো না টারজান। জংলীদের কুঁড়ের হাল হকিকত জানা আছে তার। ওতে থাকার চেয়ে বাইরে খোলা হাওয়ায় রাত কাটানো

অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। বললো, খালি খাবার হলেই চলবে। কুঁড়েতে রাত কাটানো আর এখন সম্ভব নয়। যদি রাতে আবার ফিরে আসে চিতাবাঘটা, তাড়াতে হবে না ওটাকে?

টারজান দেখেছে, জংলীদেরকে কথা শোনানোর সব চেয়ে বড় উপায় হলো, অলৌকিক ক্ষমতার ভয় দেখানো। সে চলে যাবে, কিন্তু ভয়টা দীর্ঘদিন থেকে যাবে জংলীদের মনে। সহসা কোনো কিছু করতে সাহস পাবে না ওর বিরুদ্ধে। জংলীদের গাঁয়ের ফটক খুব সহজেই টপকাতে পারতো সে, কিন্তু ইচ্ছে করেই নাটকীয়তা বেছে নিয়েছে।

খাবার নিয়ে এলো জংলীরা। দ্রুত খেয়ে নিলো টারজান। ওদেরকে ঘুমাতে যেতে বললো।

শিগগিরই নীরব হয়ে গেল গ্রামটা। বেরিয়ে চলে এলো টারজান। উঠে পড়লো গাছে। চাঁদ উঠছে। এখন না ঘুমালেও চলবে। রাতের বেলা চললে অনেকখানি এগিয়ে থাকতে পারবে। ছুটলো সে। কখনো মগডাল, কখনো একধাপ নিচের ডাল অবলম্বন করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোলো বানরের মতো।

আকাশে ভৌতিক হলুদ চাঁদ। নিচে অন্ধকার জঙ্গল। অপরূপ এক আলোছায়ার খেলা। কেমন গা ছমছম করা পরিবেশ। কিন্তু টারজানের ও-ধরনের কোনো অনুভূতি হলো না। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত রাজপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে যেন, তেমনি স্বচ্ছন্দ ভাবভঙ্গি।

ভোরের দিকে থামলো টারজান। শিকার ধরে খেলো। তার-

পর শুয়ে পড়লো গাছের তলায়। একটানা ঘুমিয়ে উঠলো দুপুর নাগাদ। আবার শুরু হলো চলা।

পথে, আরো দুটো গ্রাম পড়লো। কৌশলে ওগুলোতে ঢুকে কথা বললো অধিবাসীদের সঙ্গে। জানতে পারলো, ঠিক পথেই এগোচ্ছে।

উগাণ্ডি নদী একপাশে রেখে এগোচ্ছে টারজান। দুই দিন পর এসে পৌঁছুলো বড় একটা গ্রামে। লোকেরা তাকে দেখে পালালো না। বিশালদেহী সর্দার, কুৎসিত তার চেহারা। দাঁতগুলো চোখা, পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে করেছে ওরকম। নিশ্চয় মানুষখেকো। সাদরে টারজানকে গ্রহণ করলো সে।

একটানা পথ চলায় ক্লান্ত টারজান। আট-দশ ঘণ্টা বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিলো। রোকোফের মুখোমুখি হওয়ার আগে সতেজ করে তুলতে হবে শরীর-মন দুটোকেই। আশা করছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই দেখা পেয়ে যাবে শত্রুর।

সর্দার জানালো, মাত্র সেদিন সকালেই তার গাঁ ছেড়েছে কালো দাড়িঅলা খারাপ শাদা মানুষটা। তার আগে আর কোনো দল গেছে কিনা, জানা নেই সর্দারের। বললো, গিয়ে থাকলে হয়তো অন্য কোনো পথে গিয়েছে, তার গ্রামের ওপর দিয়ে যায়নি।

খুব ভালো ব্যবহার করছে, তবু লোকটাকে মোটেই পছন্দ হলো না টারজানের। কিন্তু ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই এখন। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তে চায়।

গোগ্রাসে খাবার গিলে নিয়ে একটা কুঁড়ের ছায়ায় শুয়ে পড়লো

টারজান। ঘুমিয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গেই।

দ্রুত ওখান থেকে সরে গেল সর্দার। ইশারায় ডাকলো দুজন বলিষ্ঠ যোদ্ধাকে। কানে কানে ফিস ফিস করে বললো কিছু। মাথা ঝোঁকালো লোক দুটো। বল্লম হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো জঙ্গলে। নদীর ধার ধরে ধরে এগিয়ে চললো উজানের দিকে, পুবে।

গাঁয়ে নীরবতা বজায় রাখার আদেশ জারি করে দিলো সর্দার। জোরে কথা নয়, গান নয়, এমন কোনো শব্দ নয়, যাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে আগন্তুকের। ঘুমন্ত মানুষটার ধারেকাছে যেতে বারণ করে দিলো সবাইকে। কোনো ভাবেই যাতে অতিথিকে বিরক্ত না করা হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখলো।

তিন ঘণ্টা পর। উগাম্বির উজানের দিক থেকে আসতে দেখা গেল কয়েকটা ক্যানো। মাল্লারা সবাই কালো। তীরে দাঁড়িয়ে হাতের বর্শা নাচিয়ে ইশারা করলো সর্দার।

তীরে এসে ভিড়লো ক্যানোগুলো। একটা নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই দুজন লোক, যাদেরকে একটু আগে খবর দিয়ে পাঠিয়েছিলো সর্দার। আরেকটা ক্যানোতে রয়েছে ছয়জন শ্বেতাঙ্গ। সবকটার ডাকাতে চেহারা। সব চেয়ে বিচ্ছিরি চেহারা কালো দাড়িঅলা লোকটার।

'শাদা মানুষটা কোথায়?' সর্দারকে জিজ্ঞেস করলো দাড়িঅলা।

'আসুন, বাওয়ানা, দেখাচ্ছি,' বললো সর্দার। 'ঘুমোচ্ছে। ও-ই আপনার শত্রু কিনা, জানি না। দেখলেই বুঝবেন। তবে, বার বার

আপনার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে সে। জঙ্গল দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলেন যাকে। চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সেজন্যেই আপনাকে খবর পাঠিয়েছি।'

'খুব ভালো করেছো।'

'ও আপনার শত্রু হলে, একটা রাইফেল আর কিছু গুলি পাওনা হয়ে গেলাম। কথা দিয়েছিলেন, মনে আছে?'

'শত্রু না হলেও পাবে,' বললো দাড়িঅলা। 'কারণ তুমি আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছো। আমার পক্ষে রয়েছো।'

'আসুন এখন, বাওয়ানা। দেরি করলে ঘুম ভেঙে যেতে পারে ওর।'

আগে আগে হেঁটে চললো সর্দার। পেছনে এগোলো শাদা-কালোদের দলটা।

পা টিপে টিপে কুঁড়ের কাছে এসে দাঁড়ালো সর্দার। পেছনে এলো দাড়িঅলা। ঘুমন্ত লোকটার ওপর চোখ পড়তেই কুৎসিত হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সর্দার। আস্তে করে মাথা ঝোঁকালো দাড়িঅলা। পা টিপে টিপে চলে এলো দুজনে সেখান থেকে। ফিসফিস করে বললো দাড়িঅলা, 'ওকে বেঁধে ফেলো। জলদি!'

শক্ত দড়ি নিয়ে টারজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বারোজন যোদ্ধা। চোখের পলকে বেঁধে ফেললো। চোখ মিট মিট করতে লাগলো টারজান। এতো দ্রুত কাজ সেরে ফেলেছে ওরা, প্রথমে বুঝতেই পারেনি সে কিছু। এখন বুঝেও আর লাভ নেই। ধরা

পড়ে গেছে।

টেনেহিঁচড়ে উঠানে এনে চিত করে ফেলা হলো টারজানকে। হাসিমুখে এগিয়ে এলো দাড়িঅলা লোকটা।

লম্বা লম্বা চুলদাড়ি। তবু নিকোলাস রোকোফকে চিনতে মোটেই অসুবিধে হলো না টারজানের।

দাঁত বের করে হাসলো রাশানটা। এগিয়ে এলো আরো কাছে।

'শুয়োরের বাচ্চা!' খেঁকিয়ে উঠলো রোকোফ। 'চিনতে পারছিস? নিকোলাস রোকোফের পিছু নেয়ার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াবো আজ তোকে!' টারজানের মুখে লাথি মারলো সে। 'এটা দিয়ে অভ্যর্থনা করলাম।'

চুপ করে রইলো টারজান।

'আজ রাতে, আমার বন্ধুরা তোকে খেয়ে ফেলার আগে জানাবো,' আবার বললো রোকোফ, 'কোথায়, কেমন আছে তোর ছেলে আর বউ। তোর ছেলের ভাগ্যে কি ঘটবে, সে-তো জানিসই। এবার জানবি তোর বৌয়ের কি হাল হবে।'

ছয়

গাঢ় সবুজ, লতানো ঝোপঝাড় আর ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাপের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে কালো দেহটা। মাংসের প্যাড লাগানো পায়ের চাপে শব্দ উঠছে না কোনো কিছুতেই, এমনকি শুকনো পাতায় পা পড়লেও নয়।

মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়াচ্ছে জানোয়ারটা। ওপরের দিকে নাক তুলে গন্ধ শুঁকছে বাতাসে। অন্যান্য হাজারো গন্ধের মাঝে চিনে নিচ্ছে পরিচিত গন্ধটা। তারপর আবার সামনে বাড়ছে। দ্রুত পায়ে পুবমুখো এগিয়ে চলেছে।

খিদেকেও অবহেলা করছে সে। অথচ আশেপাশেই রয়েছে শিকার, গন্ধ এসে নাকে লাগছে। চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হলো। কিন্তু তা-ও সে করছে না। সময়ই নেই যেন তার।

সারাটা রাত একনাগাড়ে চললো সে। পরদিনও হাঁটলো। মাঝে একবার থেমে শিকার ধরেছে। তাড়াহুড়ো করে ছিঁড়ে কোনোমতে গিলেছে শুধু। পেট ভরতেই উঠে আবার চলতে শুরু

করেছে।

সাঝের বেলা পৌঁছে গেল সে বড় গ্রামটার কাছে। বাতাসে ভুরভুর করছে পরিচিত গন্ধটা। হ্যাঁ, এখানেই আশেপাশে কোথাও রয়েছে, যাকে খুঁজছে। পুরো গ্রামটা একবার চক্কর দিয়ে এলো সে নিঃশব্দ মৃত্যুর মতো। তারপর চট করে ঢুকে পড়লো ভেতরে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসে দাঁড়ালো একটা কুঁড়ের সামনে। মাটিতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকলো। সজাগ হয়ে উঠেছে কান। খাড়া করে কি যেন শুনলো গভীর মনোযোগে।

হঠাৎ টান টান হয়ে উঠলো তার দেহ। পরক্ষণেই ঢিল হয়ে গেল ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো। নিঃশব্দে ঘুরে চলে এলো কুঁড়ের অন্যপাশে।

সারা গাঁয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। ছোটো ছোটো পাত্রে পানি ভরে আনছে মেয়েরা। বিরাট ভোজের তোড়জোড় চলেছে। আর কয়েক ঘন্টা পরেই শুরু হবে উৎসব।

বিরাট আঙিনার মাঝখানে পোঁতা হয়েছে মোটা লম্বা খুঁটি। একপাশে আগুনের বড় কুণ্ড। ওখানে জটলা করছে কয়েকজন যোদ্ধা। কালো কুচকুচে শরীরে শাদা আর নীল রঙ মেখেছে। চোখ ঘিরে এঁকেছে রঙিন বৃত্ত, ঠোঁটে রঙ, বুকে আর পেটে বিচিত্র আঁকিবুকি। কাদা মেখে জট পাকিয়ে নিয়েছে চুল। তাতে গেঁথেছে পাখির পালক।

উৎসবের জন্যে তৈরি হচ্ছে পুরো গ্রাম। একটা কুঁড়েতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তাদের খাবার। জ্যান্ত। তবে মরবে শিগগিরই। ভয়ংকর সে মৃত্যু!

আরেকবার বাঁধন খোলার চেষ্টা করলো বনের রাজা টারজান। পারলো না। মাংসে আরো কেটে বসলো শক্ত দড়ি। তারমানে নিশ্চিত মৃত্যু!

মৃত্যু?

রোকোফের ভয়ংকর চেহারাটা আবার ভেসে উঠলো টারজানের মনের পর্দায়। কিছুই করার নেই তার। মরতে ভয় পায় না সে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর প্রিয়জনদের ভাগ্যে কি সাংঘাতিক পরিণতি ঘটবে, ভেবে কষ্ট পাচ্ছে।

টারজান বা জ্যাকের ভাগ্যে কি ঘটেছে, কোনোদিনই জানতে পারবে না জেন। না জানুক, সে-ও একদিক থেকে ভালো। মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে বেঁচে যাবে। জেনের কথা ভেবে কিছুটা স্বস্তি পেলো টারজান। পৃথিবীর বৃহত্তম শহরগুলোর একটাতে লোকজন বেষ্টিত হয়ে রয়েছে সে। ওখানে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না রোকোফ। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনেরা নিশ্চয় দেখবে জেনকে।

কিন্তু তার ছেলে?

আরেকবার বাঁধন খোলার চেষ্টা চালালো টারজান। একমাত্র সে ছাড়া ছেলেটাকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না রোকোফের

হাত থেকে। কিন্তু বাঁধনই তো খুলতে পারছে না! নাহ্, আর কোনো আশাই নেই।

বিকেলে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে ছিলো রোকোফ। মারধোর করেছে, কটূক্তি করেছে একের পর এক। টুঁ শব্দ করেনি টারজান। নীরবে হজম করেছে সব। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃতও করেনি সামান্যতম।

শত্রুর এই নির্লিপ্ততায় আরো ক্ষেপে উঠেছে রোকোফ। রাতের বেলা মজা দেখাবে, বলে দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে চলে গেছে কুঁড়ে থেকে।

সাঁঝ হয়েছে। জংলীদের হট্টগোল কানে আসছে টারজানের। আর একটু পরেই তাকে নিয়ে গিয়ে বাঁধবে ওরা খুঁটিতে। তারপর কি কি হবে জানা আছে তার। খুব ধীরে ধীরে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, রক্তপাত করে কষ্ট দিয়ে মারা হবে তাকে।

ভাবছে টারজান। হঠাৎ নাকে এসে লাগলো অতি পরিচিত একটা গন্ধ। খানিক পরেই বাইরে থেকে ভেসে এলো একটা প্রায় নিঃশব্দ শব্দ। ঠিক কুঁড়ের বেড়ার কাছেই হয়েছে শব্দটা।

ঠোঁট নড়ে উঠলো টারজানের। সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছুবে না সে শব্দ, কিন্তু বাইরের জানোয়ারটার কানে ঠিকই পৌঁছুলো।

মুহূর্ত পরেই কানে এলো চাপাগর্জন, এতোই নিচু পর্দায়, কেবল টারজনই শুনতে পেলো। কুঁড়ের বেড়ায় আঁচড়ানোর শব্দ হলো। বেড়া ফাঁক করে ঢুকে পড়ল একটা রোমশ থাবা। দেখতে দেখতে বড়সড় একটা ফোকর করে ফেললো। ঘরে এসে ঢুকলো জানোয়ারটা। টারজানের গায়ে এসে ঘষতে শুরু করলো ঠাণ্ডা নাক।

শীতা।

চাপা গলায় গরগর করতে লাগলো চিতাবাঘটা। ঠিক বুঝতে পারছে না টারজান, কি করে কথা বোঝাবে শীতাকে! তার হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলবে! ইঙ্গিতে বাঁধন দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু চিতার কমজোর মস্তিষ্কে পৌঁছুলো না সংবাদ। হাত-পায়ের বাঁধনগুলো চেটে দিতে লাগলো সে। এর বেশি আর কিছু বোঝানো যাবে না ওকে।

এই সময় কুঁড়ের দরজায় শব্দ হলো। কেউ ঢুকছে। চট করে অন্ধকার কোণে সরে গেল শীতা। ঘরে এসে ঢুকলো লোকটা। লম্বা, প্রায় উলঙ্গ এক যোদ্ধা। টারজানের পাশে এসে দাঁড়ালো। হাতের বল্লম দিয়ে খোঁচা মারলো বন্দির গায়ে।

চাপা তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করলো টারজান। চোখের পলকে ঘরের কোণ থেকে লাফিয়ে এসে পড়লো একটা কালো ছায়া। চিত করে ফেলে দিলো যোদ্ধাকে। তার বুকের ওপর উঠে এসে দাঁত বসিয়ে দিলো গলায়।

আতংকিত চিৎকার বেরিয়ে এলো যোদ্ধার গলা চিরে, থেমে গেল মাঝপথেই। রক্ত-পানি-করা একটা ঘড় ঘড়ে শব্দ বেরোচ্ছে ছেঁড়া কণ্ঠনালী থেকে। ক্রুদ্ধ গোখরোর মতো হিসিয়ে উঠলো শীতা। ছিঁড়ে ফালা ফালা করতে লাগলো কালো দেহটাকে।

স্তব্ধ হয়ে গেল বাইরের হট্টগোল। তারপর আবার শুরু হলো চাপা গলায় কথাবার্তা। দ্বিধায় পড়ে গেছে জংলীরা।

এগিয়ে আসছে কয়েকজন। তাদের মাঝে সর্দারের ভয়ার্ত কণ্ঠও

রয়েছে।

টারজানকে অবাক করে দিয়ে মৃতদেহটার ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে গেল শীতা। নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল আবার বেড়ার ফোকর দিয়ে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকগুলো।

শীতা কি চলে গেল! ভাবছে টারজান। জঙ্গলের ভয়াবহ ওই জীবগুলোকে চেনে সে। কখনো ভয়ংকর বিপদের মুখে রুখে দাঁড়ায় চূড়ান্ত দুঃসাহস দেখিয়ে, আবার সামান্য কারণেই কখনো লেজ গুটিয়ে পালায়। যেভাবে পালালো, ভয় পেয়ে পালিয়েছে বলেই মনে হলো তার। চলে গেছে, ভালোই করেছে। থাকলেই বা কি হতো? বড়জোর কয়েকজনকে আহত-নিহত করতো। তার পর কোনো এক শ্বেতাঙ্গের রাইফেলের গুলিতে শেষ হয়ে যেতো।

দরজা দিয়ে অন্ধকার কুঁড়েতে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে লোকগুলো। মশাল ধরিয়ে নিলো দুই জংলী। বাড়িয়ে ধরলো ঘরের ভেতর। তাকালো। পেছন থেকে ঘাড়ের উপর চেপে আসছে অন্যেরা।

ঘরের মেঝেতে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল এক মশালধারী। আতংকিত চিৎকার করে উঠেই ছুঁড়ে ফেলে দিলো মশালটা ঘরের ভেতরে। ঘুরে ধাক্কা দিয়ে একে একে ওকে ফেলে ছুটে চলে গেল।

নিভে যাবার আগে মুহূর্তের জন্যে মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিলো পুরো ঘর। দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে-

ছিলো যারা, সবাই দেখলো দৃশ্যটা। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে শাদা মানুষ, তার পাশেই পড়ে আছে যোদ্ধার রক্তাক্ত ছিন্ন-ভিন্ন লাশ। আর দেখার দরকার মনে করলো না কেউ। আতংকিত গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে ঝেড়ে দিলো দৌড়।

কি হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছে না জংলীরা। আগুনের ধার থেকে ভেসে আসছে তাদের উত্তেজিত কণ্ঠ। ধরেই নিয়েছে, কোনো অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে শাদা মানুষটার। ওই ক্ষমতার বলেই বন্দি থেকেও ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে যোদ্ধাকে।

ঘণ্টা খানেক ওদের আলাপ-আলোচনা শুনতে পেলো টার-জান। কথাবার্তা থেকেই বোঝা গেল, আবার সাহস সঞ্চয় করে ফিরে আসার কথা ভাবছে ওরা। কুঁড়ের ভেতরটা ভালোমতো দেখতে চায় আরেকবার।

একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো একদল যোদ্ধা। যুদ্ধের হুংকার। সাহস সঞ্চয় করছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসছে এবার।

দরজার বাইরে এসেই আবার সাহসে ভাটা পড়লো ওদের। কে আগে ঘরে ঢুকবে, এই নিয়ে ঠেলাঠেলি শুরু হলো। কেউই আগে ঢুকতে চায় না।

অবশেষে ঘরে এসে ঢুকলো দুজন শ্বেতাঙ্গ। একহাতে পিস্তল আরেক হাতে মশাল। পেছনে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে জংলীরা। বিপদ দেখলেই পালাবে।

টারজান দেখলো, দুজনের মাঝে রোকোফ নেই। থাকবে না, এটাই আশা করেছিলো সে। বিপদের মাঝে আগে এগিয়ে

আসার সাহস নেই কাপুরুষটার। জংলীদের চেয়ে সে বেশি ভয় পেলেও অবাক হবার কিছু নেই।

জংলীরা দেখলো, শাদা মানুষ দুজনের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। সাহস পেলো ওরা। একে একে এসে ঘরে ঢুকে পড়লো কয়েকজন। আতংকিত চোখে চেয়ে আছে রক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে। বার বার প্রশ্ন করলো শ্বেতাঙ্গরা, লোকটা কি করে মরেছে জানার চেষ্টা করলো, কোনো জবাবই দিলো না টারজান। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো।

শেষে ঘরে এসে ঢুকলো রোকোফ। সঙ্গে সঙ্গেই পিছিয়ে গেল আবার। লাশটার দিকে চেয়ে জংলীদের মতোই অবস্থা হয়েছে তারও। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে।

'এসো!' সর্দারকে ডাকলো রোকোফ। 'শাদা ইবলিসটাকে বের করে নিয়ে যাও! খতম করে ফেলো! নইলে আবার কোন শয়তানী করে বসবে কে জানে!'

আদেশ দিলো সর্দার তার লোককে, কিন্তু নিজে ভেতরে ঢুকলো না।

ভয়ে ভয়ে এসে টারজানকে ধরলো যোদ্ধারা। টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এলো কুঁড়ের বাইরে। কিছুই ঘটলো না দেখে ভয় কেটে গেল। পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে নিয়ে চলে এলো আগুনের ধারে, খুঁটির কাছে।

হৈ-হৈ করে উঠলো জংলীরা। আগুনে নতুন কাঠ ফেললো কয়েকটা মেয়ে। পানিভরা পাত্র চাপালো আগুনের ওপর। মাংস

সেদ্ধ করার ব্যবস্থা।

শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো টারজানকে। উদ্ধার পাবার আর কোনো আশা নেই।

শত্রু পুরোপুরি হাতের মুঠোয়। এবার তাকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। পাশে দাঁড়ানো এক যোদ্ধার হাত থেকে বল্লম কেড়ে নিয়ে টারজানের সামনে এসে দাঁড়ালো রোকোফ। খোঁচা লাগালো বন্দির শরীরে। শাদা চকচকে চামড়া বেয়ে নামলো রক্তের সরু ধারা। কালচে দেখাচ্ছে আগুনের আলোয়।

ক্রুর হাসি ফুটেছে রোকোফের ঠোঁটে। বল্লমটা ফেলে দিয়ে আরো কাছে চলে এলো। সমানে কিল-ঘুসি-লাথি মারতে লাগলো টারজানকে। সেই সঙ্গে চললো মুখখিস্তি।

টুঁ শব্দ করলো না টারজান। মুখের হাসি মলিন হলো না এক বিন্দু।

ভয়ানক ক্ষেপে গেল রোকোফ। কোথায় কেঁদেকেটে মিনতি করবে বন্দি, মাফ চাইবে তার কাছে, তবেই না মজা! অথচ সেসব কিছুই করছে না লোকটা। আবার মাটি থেকে বল্লম কুড়িয়ে নিলো রোকোফ। সোজা বল্লম তুললো টারজানের হৃৎপিণ্ড বরাবর।

তবু মলিন হলো না টারজানের হাসি।

বল্লম বিঁধিয়ে দিতে গেল রোকোফ। হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে সরিয়ে নিয়ে এলো সর্দার। শুরুতেই উৎসবের মজা মাটি করে দিতে চাইছে শাদা মানুষটা।

'থামুন, বাওয়ানা!' কর্কশ গলায় বলে উঠলো সর্দার। 'আমা-

দের নাচই শুরু হলো না এখনো। শেষ করে দিতে চাইছেন বন্দিকে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওর জায়গায় নিয়ে গিয়ে আপনাকে বাঁধবো!' রোকোফের সাহস দেখা হয়ে গেছে তার। লোকটাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, বুঝে গেছে সে।

সর্দারের ভয়ংকর চেহারার দিকে চেয়ে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল রোকোফ। পিছিয়ে এসে গাল দিতে লাগলো টারজানকে। বললো, টারজানের হৃৎপিণ্ডটা সে একা খাবে। তার ছেলেকে নিয়ে কি করবে, সে সম্পর্কেও লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিলো।

'ভাবছো, ইংল্যাণ্ডে নিরাপদেই রয়েছে তোমার বউ, না?' বললো রোকোফ। 'গাধা! গাধা আর কাকে বলে! বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে, নিরাপত্তা থেকে অনেক দূরে রয়েছে এখন সে। বল্লমের খোঁচা খেয়ে মরো। মরার আগ পর্যন্ত ভাবো বৌ-ছেলের কথা। ভাবো, দেখো কেমন মজা লাগে!'

শুরু হয়ে গেল নাচ। নাচ মানে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে লাফ-ঝাঁপ। এসব অনেক দেখা আছে টারজানের। আগুনের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে কালো চকচকে রঙ মাখা শরীরগুলো। নরক থেকে নেমে এসেছে যেন একদল শয়তান। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওরা, হাতের বল্লম দোলাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে খোঁচাখুচি।

এলো প্রথম খোঁচা। খুব আলতো। চোখা ফলার খোঁচায় চামড়া ছিদ্র হলো শুধু। রক্ত বেরোতে শুরু করলো। এলো দ্বিতীয়

খোঁচা। একই রকম আলতোভাবে। এরকম চলতে থাকলে অনেকক্ষণ।

হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে এলো একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার। ভয়াবহ।

থমকে গেল যোদ্ধারা ক্ষণিকের জন্যে।

জবাবে একই রকম চিৎকার করে উঠলো টারজান।

স্তব্ধ হয়ে গেছে জংলীরা। দ্বিধা করছে। তাড়াতাড়ি বন্দিকে শেষ করে দেবার জন্যে সর্দারকে তাড়া দিচ্ছে রোকোফ। হঠাৎ বল্লম হাতে লাফিয়ে কাছে চলে এলো সর্দার। বল্লম তুললো।

ঠিক এই সময় আবার শোনা গেল তীক্ষ্ণ শিস। একসঙ্গে ঘুরে গেল সবকটা চোখ। যে কুঁড়েতে বাঁধা ছিলো টারজান, তার দরজায় দেখা যাচ্ছে দুটো জ্বলন্ত সবুজ চোখ। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এলো চোখের মালিক, একটা কালো ছায়ার মতো। জংলীদের মাঝখান দিয়ে এসে দাঁড়ালো টারজানের পাশে। ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠলো।

আগুনের আলোয় বিকট দেখাচ্ছে কালো মুখটা। ঝকঝকে শাদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে লাল মুখের ভেতরটা। লালা গড়াচ্ছে। হিসহিস শব্দ করছে সাপের মতো। নড়ার কথাও ভুলে গেছে যেন দর্শকরা, কি কালো, কি শ্বেতাঙ্গ, সবাই।

কুঁড়ের দিকে চোখ টারজানের। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে আরো একটা ছায়া, শুধু সে-ই দেখতে পেলো।

সাত

জংলীরা বুঝে গেল, ওটা রক্ত-মাংসের চিতা, প্রেতাত্মা বা অপ-দেবতা নয়। দ্বিগুণ উদ্যমে চেঁচিয়ে উঠলো ওরা। বল্লম তুলে নেচে নেচে এগিয়ে আসতে শুরু করলো আবার।

দেরি সইছে না রোকোফের। সর্দারকে বারবার বলছে, টার-জানের বুকে বল্লম বিঁধিয়ে দিতে। আপদ যতো তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়া যায়, ততোই মঙ্গল।

বল্লম নিয়ে এগিয়ে এলো সর্দার। টারজানের দৃষ্টি অনুসরণ করে হঠাৎ তাকালো পেছনে। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সর্দারকে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখে আর সবাইও ফিরে চাইলো। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। এগিয়ে আসছে আকুতের দল। আগুনের আলো আর জ্যোৎস্নায় ভয়ংকর দেখাচ্ছে ওদের চেহারা।

যে যেদিকে পারলো, ছুট লাগালো জংলীরা। শ্বেতাঙ্গরাও দাঁড়িয়ে রইলো না। চেঁচিয়ে উঠলো টারজান। আক্রমণ করার আদেশ দিলো আকুতের দলকে।

গর্জে উঠে ছুটে এলো বনমানুষেরা। শীতাও গিয়ে যোগ দিলো

ওদের সঙ্গে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগলো, যাকে পেলো নাগালে।

দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল পুরো আঙিনা। জংলী আর শ্বেতাঙ্গরা, সবাই গিয়ে ঢুকে পড়েছে বনে। পুরো আঙিনায় রয়েছে এখন শুধু আকুতের দল আর শীতা। জংলীদের পেছন পেছন তেড়ে যাচ্ছিলো ওরা, ডেকে ফেরালো টারজান। তার বাঁধন খুলে দিতে বললো। আশ্চর্য! বনমানুষদেরকেও বোঝাতে পারলো না সে, এমনকি আকুতকেও না। বনমানুষের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির কতো তফাৎ, ভেবে অবাক হলো। কিন্তু, কার্চাকের দলটা তো এতো বোকা ছিলো না! যা-ই হোক, এখন ওসব ভাবার সময় নেই। আগে বাঁধন খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার বোঝানোর চেষ্টা করলো টারজান। কিন্তু আকুতের মোটা মাথায় ঢুকলো না ব্যাপারটা। কয়েকবার শুধু সে টারজানের চারপাশে চক্কর মারলো, ব্যস। বনমানুষদেরকে দড়ি দিয়ে বাঁধে না কেউ, খোলেও না, কাজেই ওসব কথা বোঝানোর জন্যে শব্দও সৃষ্টি হয়নি ওদের ভাষায়।

ভাবনায় পড়ে গেল টারজান। আপাতত পালিয়েছে, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে আবার ফিরে আসতে পারে জংলীরা। অল্প কয়েকটা বনমানুষ কিংবা শীতা পেরে উঠবে না তাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই বাধলে।

কমজোর মগজ, তবু চিতাবাঘটা যথেষ্ট করেছে। ফিরে গিয়ে আকুতের দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। এখন টার-

জানের চারপাশে ঘুরছে, মাঝেমধ্যে এসে পায়ে গা ঘষছে।

কিন্তু মুগাম্বি কোথায়? সে এলে তো বাঁধন খুলে নিতে পারতো। আকুতকে জিজ্ঞেস করলো টারজান। তেমন কিছুই বলতে পারলো না বোকাটা। শুধু বার বার আঙুল তুলে বনের দিক দেখিয়ে দিলো, যেদিক থেকে এসেছে ওরা।

জংলীরা ফিরলো না। বনের ভেতর থেকে তাদের সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না।

রাত বাড়ছে। মাঝরাত পেরোলো। একসময় শেষ হয়ে এলো রাত। পুবের আকাশে ধূসর আলোর আভাস। আশংকা বাড়ছে টারজানের। দিনের আলোয় অপদেবতার ভয় কেটে যাবে জংলী-দের। দল বেঁধে এসে আক্রমণ চালাবে তখন। ঠেকাতে পারবে না আকুতের দল।

আলো ফুটলো। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে জংলীদের। নিশ্চয় গাঁয়ে ফিরে আসছে ওরা।

বনের প্রান্তে এসে গেছে জংলীরা। একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, বল্লম আর তীর-ধনুক নিয়ে ছুটে আসার তোড়জোড় করছে। খানিক পরেই ফটকের কাছে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখা গেল ওদের-কে। গর্জে উঠে ছুটে গেল আকুতের দল আর শীতা। চোখের পলকে আবার উধাও হয়ে গেল জংলীরা। খানিক পরেই ফিরে এলো আবার। আবার তেড়ে গেল বনমানুষের দল, শীতা। পালালো জংলীরা।

এভাবেই চললো কিছুক্ষণ। পুরোপুরি সাহস সঞ্চয় করে উঠতে

পারেনি এখনো। বনমানুষগুলোকেই তাদের বিশেষ ভয়।

অবশেষে ভয় কাটিয়ে উঠলো ওরা। কয়েকটা দুঃসাহসী যোদ্ধা ঢুকে পড়লো ফটকের এপাশে। বনমানুষেরা তেড়ে আসছে দেখেও পালালো না। বরং বল্লম ছুঁড়ে মারলো। সাহস বেড়ে গেল জংলী-দের। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে লাগলো ওরা ভেতরে। ছুটে এলো দল বেঁধে।

টারজান বুঝলো, এবারে শেষ হয়ে যাবে সব। বেশ কিছু জংলী মরবে অবশ্য, তবে তার দলও বাঁচবে না। তারমানে সে-ও শেষ। আর এরই মাঝে যদি রাইফেল নিয়ে এসে পড়ে শ্বেতাঙ্গরা, কয়েক মিনিটও লাগবে না শেষ করে দিতে।

আঙিনায় মাখামাখি চলে এসেছে জংলীরা। তেড়ে গেছে বন-মানুষের দল আর শীতা। লড়াই বাধে বাধে। হঠাৎ একটা কুঁড়ের দিকে ফিরে তাকালো আকুত। যেটা থেকে বেরিয়ে এসেছিলো গতরাতে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে টারজানও তাকালো। হাসি ফুটলো মুখে। ছুটে আসছে মুগাম্বি।

জানোয়ারের দল আর জংলীদের মাঝে বেধে গেল তুমুল লড়াই। আকুত আর শীতার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারছে না কেউ। অন্য বনমানুষরাও লড়ছে প্রাণপণে।

ছুরির কয়েকটা দ্রুত পোঁচে কেটে গেল দড়ির বাঁধন। মুক্ত হয়ে গেল টারজান। একটা বল্লম আর একটা মুগুর তুলে নিয়ে ছুটে গেল সে। মুগাম্বিও গিয়ে যোগ দিলো লড়াইয়ে।

আর বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না জংলীরা। ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে

পালাতে শুরু করলো ফটকের দিকে। পেছনে তেড়ে গেল শীতা আর বনমানুষেরা। একের পর এক বল্লম ছুঁড়ে মারছে টারজান আর মুগাম্বি পলায়নপর শত্রুদের দিকে। দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল আবার আঙিনা। মাটিতে পড়ে আছে শুধু লাশ আর লাশ। রক্তে পিচ্ছিল মাটি।

একটা জংলীকে জ্যান্ত ধরে ফেলেছে টারজান। তাকে জিজ্ঞেস করলো, শ্বেতাঙ্গরা কোথায়?

জংলীটা জানালো, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে পালিয়ে চলে গেছে শাদা মানুষেরা। ঘাট থেকে কয়েকটা ক্যানো নিয়ে উজানের দিকে গেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে কাভিরির গাঁ থেকে আনা কুলিদের। ওরাই বেয়ে নিয়ে গেছে ক্যানো। কুলিদেরকে আর রাইফেলের ভয় দেখাতে হয়নি, বনমানুষের ভয়েই নৌকা বেয়ে পালিয়েছে তাড়াতাড়ি।

সুতরাং, আবার পিছু নিতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে রোকোফকে। জানতে হবে ওর কাছ থেকে, কোথায় আছে টারজানের ছেলে।

গাঁ থেকে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো টারজান। জংলীদের ছায়াও দেখা গেল না আর।

দিনের পর দিন আবার এগিয়ে চলার পালা। নদীর ধার ধরে ধরে এগোতে হচ্ছে। সঙ্গে বনমানুষরা থাকায় গতি হয়ে যাচ্ছে শ্লথ। মুগাম্বির কাছে জানতে পারলো টারজান, এক বিকেলে খাবার সংগ্রহের জন্যে ডাঙায় উঠেছিলো সে আকুতের দল আর

শীতাকে নিয়ে। কাভিরির লোকদেরকে বিশ্বাস করে নৌকায় রেখে এসেছিলো, করেছিলো মস্ত ভুল। খেয়েদেয়ে ফিরে গিয়ে দেখলো, চিহ্নও নেই ক্যানোর। পালিয়েছে লোকগুলো। তারপর থেকে হাঁটা পথেই অনুসরণ করে এসেছে টারজানকে। ভাগ্যিস শীতা আর আকুত ছিলো সঙ্গে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে অনুসরণ করতে পেরেছে ওরা। বনমানুষেরা দ্রুত চলতে পারেনি, তাই শীতাকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে সে টারজানের খোঁজে।

দলটা অনেক ছোটো হয়ে গেছে এখন। জংলীদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কয়েকটা বনমানুষ মারা পড়েছে। আকুতের দলে সে নিজেসহ এখন মাত্র পাঁচজন অবশিষ্ট রয়েছে। বারোজন নিয়ে বেরিয়েছিলো, সাতজনই নেই।

পথে জংলীদের গাঁ পড়লো। কিন্তু কেউই আর শাদা খারাপ মানুষটার খোঁজ দিতে পারছে না। রোকোফের আগে যাওয়া দলটার ব্যাপারেও কেউ কিছু জানে না।

নদীর ধারে একটা জায়গায় এসে থামলো টারজান। চিহ্ন দেখে বোঝা গেল, এখানে নেমেছে রোকোফ। তারপর এগিয়ে গেছে উত্তরে গভীর বনের দিকে।

চিহ্ন অনুসরণ করে করে এগিয়ে চলেছে টারজান আর তার দল। কিন্তু দেরি করে ফেলছে খুব বেশি। অবশেষে বাধ্য হয়েই মুগাম্বির ওপর আবার দলের ভার দিয়ে আগে আগে এগিয়ে চললো সে। পথে আরো কয়েকটা গ্রাম পড়লো। আবার আগের সেই ঘটনা। যেখানেই যায় টারজান, দেখে গ্রাম খালি। একজন

মানুষও নেই। কিসের ভয়ে যেন পালিয়েছে।

গাঁয়ে ঢুকে লাভ নেই, বুঝে গেছে টারজান। কাউকে পাওয়া যাবে না। বনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা শিকারীদের খুঁজে বের করায় মন দিলো সে। পাওয়াও গেল দু'একজনকে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। কোনোরকম খোঁজ দিতে পারলো না তারা। নাকি ইচ্ছে করেই মুখ খুলছে না?

একদিন, এক শিকারীর চিহ্ন অনুসরণ করে অবশেষে তার দেখা পেলো টারজান। একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লম তুলছে কিছু একটাকে লক্ষ্য করে। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সে। দেখলো, মাটিতে পড়ে থাকা একজন শ্বেতাঙ্গকে মারতে চাইছে শিকারী।

লাফ দিলো টারজান। উড়ে এসে পড়লো শিকারীর কাছে। এক থাবায় তার হাত থেকে ফেলে দিলো বল্লম। আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই শ্বেতাঙ্গর গায়ে আমূল বিঁধে যেতো বল্লমের ফলা।

পাঁই করে ঘুরলো শিকারী। চোখ জ্বলছে। একটানে কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়েই আক্রমণ করে বসলো টারজানকে।

কয়েক সেকেণ্ডের বেশি স্থায়ী হলো না লড়াই। মারা পড়লো শিকারী।

লোকটার ভাঙা ঘাড়ে পা তুলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো টারজান। তারপর তাকালো শ্বেতাঙ্গর দিকে।

আরে! কিনশেডের বাবুর্চি! বিশালদেহী কুৎসিত সেই সুইডিশ! কিছু জিজ্ঞেস করলে একটা কথাই শুধু যে বলতো: আমার মনে হয় শিগগিরই খুব শক্ত একটা আঘাত খাবেন। বুকে রক্ত।

জ্বলে উঠলো টারজানের চোখ। তাহলে এই সেই শ্বেতাঙ্গ। একে দিয়েই তার ছেলেকে মানুষখেকোদের কাছে পাঠিয়েছে রোকোফ! আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল টারজানের। জেন ইংল্যাণ্ডে নেই, রোকোফ বলেছে। তারমানে শাদা মেয়েমানুষের রহস্যেরও সমাধান হয়ে গেল। নিশ্চয় ও জেন, আর কেউ নয়।

'আমার স্ত্রী কোথায়?' গর্জে উঠলো টারজান। 'বাচ্চাটা কোথায়?'

কাশতে শুরু করলো লোকটা। রক্ত বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। দম নিতেই কষ্ট হচ্ছে তার। অপেক্ষা করে রইলো টারজান।

কাশি থামলো লোকটার। খুব কষ্ট হচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে। হাত দিয়ে মুখের রক্ত মুছলো। হাঁপাচ্ছে।

'আমার স্ত্রী আর ছেলে কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করলো টারজান। 'কোথায়?'

আঙুল তুলে একটা দিক দেখালো লোকটা। 'রাশানটা···' ফিসফিস করে বললো, '···ধরে নিয়ে গেছে!'

'তুমি এখানে কেন? রোকোফের সঙ্গে গেলে না কেন?'

'আমাদের ধরে ফেলেছিলো,' খুব আস্তে কথা বলছে লোকটা। এতোই নিচু গলায়, বসে পড়ে কান পাততে হলো টারজানকে। 'ধরে ফেলেছিলো! আমার লোকেরা পালালো। লড়াই করেছিলাম। পারলাম না। আমাকে গুলি করে হায়েনাদের খাবার জন্যে ফেলে রেখে গেছে রোকোফ! তোমার ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেছে।'

'কেন?' তোমাকে গুলি করলো কেন? তুমি তো রোকোফেরই লোক?'

'না,' ফিসফিস করে বললো লোকটা, 'তার লোক নই। শয়তানটার হাত থেকে তোমার ছেলে আর স্ত্রীকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম! আমারও একটা বাচ্চা আছে দেশে। আমিও বাপ। তোমার ছেলের সর্বনাশ করবে রোকোফ, এটা সইতে পারিনি।'

লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো টারজান। হাত রাখলো গায়ে। 'দুঃখিত। কি কি ঘটেছিলো, বলতে পারবে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে জানালো লোকটা, জেনকেও ধরে কিনশেডে তুলে নিয়েছিলো রোকোফ। টারজানের কামরার ওপরের কেবিনেই রাখা হয়েছিলো তাকে। টারজানকে জঙ্গল দ্বীপে নামিয়ে দেবার পর, একদিন জোর করে জেনের সর্বনাশ করতে চায় রোকোফ। বাধা দিয়েছে বাবুর্চি। তারপর রাতের বেলা একটা নৌকায় করে জেন আর জ্যাককে নিয়ে পালিয়েছে। ভেবেছে, জঙ্গল পার হয়ে শ্বেতাঙ্গদের কোনো উপনিবেশে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু পারলো না। ধরে ফেলেছে তাকে রোকোফ। গুলি করে ফেলে রেখে গেছে এখানে।

'এর চেয়ে বেশি কিছু করার ছিলো না তোমার, ভাই,' নরম গলায় বললো টারজান, 'আমার জন্যে নিজের জীবন দিতে বসেছো তুমি। চলো, তোমাকে নিয়ে শহরে যাবো আমি। ডাক্তার দেখাবো।'

মলিন হাসি হাসলো লোকটা। মাথা নাড়লো। 'আর কোনো

লাভ নেই। জলদি যাও। তোমার ছেলে আর স্ত্রীকে বাঁচাও রোকোফের হাত থেকে। এতোক্ষণে ক্ষতি করে ফেলেছে কিনা কে জানে!' দ্বিধা করলো সে। 'হায়েনাদের ভীষণ ভয় করি আমি!··· এক কাজ করো না, ওদের কাজটা তুমিই করে দাও···যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবো!'

কেঁপে উঠলো টারজান। কোলে তুলে নিলো লোকটার মাথা। 'আমি বসছি তোমার কাছে। হায়েনারা আসতে পারবে না।'

বার বার চলে যেতে বললো বাবুচি, জেন আর জ্যাককে বাঁচাতে বললো! কিন্তু কিছুতেই নড়লো না টারজান। লোকটাকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারবে না সে কিছুতেই।

আবার কেশে উঠলো লোকটা। নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করলো। সময় ফুরিয়ে এসেছে বাবুচির, বুঝতে পারলো টারজান। চুপ করে গেল লোকটা। স্থির হয়ে গেল।

টারজান ভাবলো, মারা গেছে বাবুচি। কোলের ওপর থেকে মাথা নামিয়ে দিতে যাবে, এই সময় চোখ খুললো লোকটা। হাসলো। ফিসফিস করে বললো, 'আমার মনে হয় শিগগিরই খুব শক্ত একটা আঘাত···' চুপ হয়ে গেল সে। একপাশে কাত হয়ে গেল মাথা। এবার সত্যই মারা গেছে।

আট

অগভীর একটা গর্ত খুঁড়লো টারজান। কবর দেবে। লাশটাকে এভাবে হায়েনার খাবার জন্যে ফেলে রেখে যেতে মন চাইলো না তার।

বাবুচিকে কবর দিলো টারজান। চাপা দিয়ে রাখলো বড় বড় পাথর। তারপর আবার এগিয়ে চললো রোকোফকে অনুসরণ করে। রাগে জ্বলছে সে। এই মুহূর্তে রোকোফকে হাতের কাছে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

কয়েকটা সরু বুনো পথের মিলনস্থলে এসে দাঁড়ালো টারজান। চারপাশে গভীর জঙ্গল এদিক ওদিক বেরিয়ে গেছে পথগুলো। জন্তুজানোয়ার আর মানুষের পায়ের ছাপ, অসংখ্য। ওগুলোর ভেতর থেকে রোকোফের জুতোর ছাপ খুঁজে বের করা খুবই মুশকিল। কোনদিকে কোন পথে গেল সে? অবশেষে খুঁজে পেলো, কোন পথে গেছে।

এগিয়ে চলেছে টারজান। বিকেল পেরিয়ে গেছে। আকাশের অবস্থা সুবিধের নয়। কালো মেঘে ঢেকে গেছে। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি

হতে পারে।

শুরু হলো ঝড়। প্রথমে এলো বৃষ্টি, বড় বড় ফোঁটা। তারপর অঝোর ধারায়। সেই সঙ্গে বাতাস। মড়মড়াৎ করে ভেঙে পড়তে শুরু করলো ডালপাতা, গাছ। চাপা পড়লে চ্যাপ্টা হয়ে যেতে হবে। বড় একটা গাছের গায়ে খোঁড়ল দেখতে পেয়ে টারজান ঢুকে পড়লো তার ভেতরে।

আশা করেছিলো, সকালেই থেমে যাবে, কিন্তু থামলো না। এসব জঙ্গলে একবার ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে আর সহজে থামতে চায় না। একনাগাড়ে চলে দিনের পর দিন। খোঁড়লে আটকে থাকতে বাধ্য হলো টারজান।

সাত দিন সাত রাত একনাগাড়ে বইলো ঝড়। খোঁড়লেই রইলো টারজান। ঝড়ের তাড়া খেয়ে আশপাশ দিয়ে ছুটে যায় জন্তু-জানোয়ার। চট করে বেরিয়ে একটা হরিণ বা শুয়োর ধরে নিয়ে আবার খোঁড়লে ঢুকে পড়ে সে। খাওয়ার অসুবিধে নেই।

আট দিনের দিন সকালে মেঘ কেটে গেল। সূর্য দেখা দিলো। হেসে উঠলো আবার পুরো বনভূমি। খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে এলো টারজান। কিন্তু এবার যাবে কোনদিকে? পানিতে ধুয়েমুছে গেছে রোকোফের চিহ্ন। জীবনে এই প্রথম বনের ভেতরে অসহায় বোধ করলো বনের রাজা। আবার ফিরে যাবে যেদিক থেকে এসে-ছিলো? উগাম্বি নদীর ধার ধরে এগোবে? রোকোফ আবার নদীর ধারে ফিরে গেছে, না বন পেরোনোর চেষ্টা করছে, কে জানে! বনের ভেতর দিয়ে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলো টারজান।

সূর্য দেখে উত্তর-পুব কোণ বেছে নিয়ে এগিয়ে চললো দ্রুত।

পরের দিন জংলীদের একটা গ্রামে এসে হাজির হলো। টারজানকে দেখেই আঁতকে উঠলো জংলীরা। যে যেদিকে পারলো, ছুট লাগালো। ঢুকে পড়লো বনে।

এক তরুণ যোদ্ধাকে তাড়া করলো টারজান। ধরে ফেললো। হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে গেছে লোকটার। থরথর করে কাঁপছে। আতংকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন দুই চোখ।

অনেক কষ্টে লোকটাকে শান্ত করলো টারজান। ভয় পাওয়ার কারণ কি, জানতে চাইলো।

জানা গেল, দিন কয়েক আগে এই গাঁয়ের ওপর দিয়ে গেছে শ্বেতাঙ্গদের একটা দল। ওরা জানিয়েছে, পেছনে উলঙ্গ এক শাদা মানুষের নেতৃত্বে আসছে ভয়াবহ এক অপদেবতার দল। ওদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। সেই থেকেই ভয়ে ভয়ে আছে গাঁয়ের লোক। আজ খালি-গা শাদা মানুষটাকে দেখেই পালিয়েছে তাই।

ঘৃণায় তেতো হয়ে গেল টারজানের মন। আরেকবার শয়তানী চাল চেলে জয়ী হয়েছে শয়তান রোকোফ! অপদেবতার ভয় সৃষ্টি করে জংলীদের সাহায্যের পথ বন্ধ করে রেখে গেছে টারজানের জন্যে। ও আরো বলে গেছে, শাদা মানুষটাকে যদি হত্যা করতে পারে জংলীরা, তাহলে বিশেষ পুরস্কার দেবে। শুধু তাকে গিয়ে জানালেই হলো। কিন্তু টারজানকে দেখেই ভয়ে আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছে জংলীদের। পালিয়েছে।

অনেকক্ষণ হলো ধরা পড়েছে, কিন্তু এখনো তার কোনো ক্ষতি করেনি শাদা মানুষটা। সাহস ফিরে পেলো তরুণ জংলী। টারজানকে নিয়ে গাঁয়ে এলো সে। তারপর ওকে রেখে বনের ভেতরে গেল তার লোকদেরকে খবর দিতে। শাদা মানুষটার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে সে তাদের কোনো ক্ষতি করবে না, বুঝে গেছে।

বেশ অনেকক্ষণ পরে গাঁয়ের লোকদেরকে নিয়ে ফিরে এলো তরুণ। সঙ্গে এসেছে তাদের সর্দার। বুড়ো। বেঁটেখাটো। হাত দুটো শরীরের তুলনায় লম্বা। সারা গায়ে ঘন রোম। বনমানুষ হতে হতে যেন মানুষ হয়ে গেছে লোকটা।

চেহারা আর দাঁত দেখেই বুঝতে পারলো টারজান, এরা মানুষখেকো। শুধু অপদেবতার ভয়ই ঠেকিয়ে রেখেছে ওদেরকে এতোক্ষণ। নইলে আরো আগেই তাকে ধরে পুড়িয়ে খাবার বন্দোবস্ত করতো।

সর্দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলো টারজান, রোকোফের দল পুব উপকূলের দিকে এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই কুলি বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে তার দলে। পাঁচজন কুলিকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছে সে অন্যদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে। কিন্তু বেপরোয়া হয়ে উঠেছে কুলিরা। খুব বেশিদিন আর ওরা শাদা মানুষটার সঙ্গে থাকবে বলে মনে হয় না, জানালো সর্দার। বার বার জিজ্ঞেস করেও শাদা মেয়েমানুষ আর বাচ্চার কথা জানা গেল না। কোনো কারণে ব্যাপারটা গোপন রাখছে না তো সর্দার?

খাবার চাইলো টারজান। খুব খুশি হয়েই দিতে রাজি হয়ে গেল

সর্দার। এমনকি তাকে গাঁয়ে রাত কাটিয়ে যাবার অনুরোধও করে বসলো। ভালো একটা কুঁড়েঘর ছেড়ে দেয়া হবে তার জন্যে।

পথশ্রমে ক্লান্ত টারজান। কি ভেবে রাজি হয়ে গেল রাত কাটাতে। ভোরে উঠেই রওনা হয়ে পড়বে আবার।

গাঁয়ের সব চেয়ে বড় কুঁড়ে, যেটাতে সর্দার থাকে, সেটা ছেড়ে দেয়া হলো টারজানের জন্যে। সর্দারের বৃদ্ধা স্ত্রীকে বের করে দেয়া হলো, বাইরে রাত কাটাবে। সর্দার নিজে থাকবে আরেকটা ছোটো কুঁড়েতে, তার কমবয়েসী এক স্ত্রীর ঘরে। রাতে কোনো কিছুর দরকার হতে পারে, তাই কয়েকজন তরুণ থাকবে টারজানের সঙ্গে। ফাইফরমাশ খাটার জন্যে। সর্দারের এই আতিথেয়তায় অবাকই হলো সে।

বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শীতে কষ্ট পাবে বৃদ্ধা, মরেও যেতে পারে দাঁতকপাটি লেগে। তাকে কুঁড়েতেই থাকতে বললো টারজান। ঘুমাতে অসুবিধে হবে না তার। খুব খুশি হলো বৃদ্ধা। দাঁত শূন্য মাড়ি বের করে হাসলো।

হঠাৎ হৈ-চৈ শোনা গেল গাঁয়ের সীমানায়। কারণ কি? এক-জনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো টারজান, শিকারে বেরিয়ে-ছিলো কয়েকজন শিকারী। শিকার করে ফিরেছে। সঙ্গে মৃত জানোয়ার। ভোজ হবে আজ রাতে।

টারজানকে ভোজে যোগ দিতে অনুরোধ করলো সর্দার। রাজি হলো না সে। ঘুমানো দরকার। খুব ভোরে উঠে আবার বেরোতে হবে।

বাইরে আগুন জ্বললো। বেজে উঠলো ঢাক। মহা হৈ-চৈ। কিন্তু এতো গোলমালের মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়লো টারজান।

অনেক রাতে গায়ের ওপর হাত পড়তেই চমকে জেগে উঠলো সে। বাইরে ঢাকের শব্দ থেমে গেছে। হৈ-চৈ কমে এসেছে অনেক। হুড়োহুড়ির শব্দই বেশি হচ্ছে এখন। তারমানে খাচ্ছে জংলীরা।

'কে?' জিজ্ঞেস করলো টারজান। 'বনের রাজার গায়ে চুপি চুপি হাত রাখে কে?'

'চুপ, বাওয়ানা!' চাপা ভাঙা ভাঙা একটা কণ্ঠ। 'আমি তাম্বুজা, সর্দার মগানউয়াজামের বউ। যার ঘরে তুমি রয়েছো। বাইরের ঠাণ্ডায় যাকে বের করে দাওনি তুমি।'

'টারজানের কাছে কি দরকার তাম্বুজার?'

'আমাকে দয়া করেছো তুমি। এখন আর কেউ আমাকে দয়া করে না, বুড়ি হয়ে গেছি বলে। তোমার দয়ার প্রতিদান দিতে এসেছি। তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিতে এসেছি।'

'হুঁশিয়ার?'

'তোমার সঙ্গে কয়েকটা তরুণকে থাকার নির্দেশ দিয়েছে মগান-উয়াজাম,' বললো তাম্বুজা। 'ওদের সঙ্গে সে যখন কথা বলছিলো আমি ছিলাম কাছাকাছি। শুনেছি। চাপা গলায় কিছু আদেশ দিয়েছে ওদেরকে আমার স্বামী।'

'কি আদেশ?'

'ভোজ শেষ হলে আসবে ওরা এ-ঘরে। যদি দেখে তুমি ঘুমিয়ে আছো, খুন করবে তোমাকে। যদি দেখে, জেগে আছো, শুয়ে

পড়বে তোমার পাশে। তারপর তুমি ঘুমিয়ে পড়লে খুন করবে। খবর নিয়ে যাবে খারাপ শাদা লোকটার কাছে। অনেক পুরস্কার দেবে লোকটা, বলে গেছে মগানউয়াজামকে।'

এতোক্ষণে বুঝতে পারলো টারজান, কেন তার এতো খাতির-যত্ন! 'খবর দেবে কি করে? খারাপ শাদা মানুষটা কোন দিকে গেছে, জানে না মগানউয়াজাম।'

'জানে, জানে,' বললো বুড়ি। 'মিথ্যে কথা বলেছে সে তোমার সঙ্গে। খুব বেশি দূরে যায়নি শাদা মানুষটা। কাছাকাছিই তাঁবু ফেলেছে।'

'কোথায়?'

'তুমি যেতে চাও ওদের কাছে?'

'চাই।'

'জায়গাটার নাম বলতে পারবো না, কিন্তু চিনি। তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো।'

বেড়ার গায়ে কান পেতে তাদের কথাবার্তা শুনছে আরেকজন, জানলো না টারজান কিংবা তাম্বুজা। সর্দারের এক মেজো স্ত্রীর ছেলে, বুয়ালু। সারাক্ষণই বুড়ি তাম্বুজার পেছনে লেগে থাকে। তার বিরুদ্ধে একথা-ওকথা গিয়ে লাগায় বাপকে। ধরে ধরে বুড়িটাকে মারে মগানউয়াজাম। এখনো, সব কথা শুনতে পেলো শয়তান ছেলেটা। তাড়াতাড়ি ছুটলো বাপকে খবর জানাতে।

'এসো তাহলে,' টারজানের শেষ কথাটা শোনার আগেই চলে গেছে বুয়ালু। 'এখুনি বেরিয়ে পড়বো।'

নিঃশব্দে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়লো দুজনে : ঢুকে পড়লো বনে। হারিয়ে গেল অন্ধকারে। ওরা জানলো না, খানিক পরেই আরো দুজন লোক ঢুকে পড়লো বনে। তরুণ দুই যোদ্ধা। ভিন্ন পথে দ্রুত ছুটে চললো রোকোফের কাছে। তাকে হুঁশিয়ার করে দিতে।

নয়

জংলীদের কুঁড়েতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেন ক্লেটন। দু'গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। দু'হাতে ধরা রয়েছে শিশুটা, যাকে এতো কষ্ট করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মাইলের পর মাইল বয়ে এনেছে। বাচ্চাটা এখন মৃত।

বাড়ি থেকে অনেক দূরে রয়েছে এখন ওরা, দুর্গম জঙ্গলে। অসুস্থ বাচ্চাটাকে ডাক্তার দেখানোরও উপায় ছিলো না।

সেই মুহূর্তটার কথা মনে পড়ছে জেনের, যখন বুঝতে পেরেছে বাচ্চাটা তার নিজের বাচ্চা নয়।

সবে সকাল হয়েছে। দাঁড় বাইছে কিনশেডের সেই বাবুর্চি, এনডারসন। নদীর দু'ধারে ঘন জঙ্গল। ভাপ উঠছে। গলুইয়ের কাছে বসে আছে জেন। কোলে কম্বলে জড়ানো শিশু। ঘুমিয়ে আছে। কতোদিন পর কাছে পেয়েছে! রাতের অন্ধকারে দেখতে পারেনি। আলো ফুটতেই কম্বল সরিয়ে শিশুর মুখটা বের করলো সে। চেঁচিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

'কি হলো?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো এনডারসন।

'বাচ্চাটা···আমার নয়!' ঝট করে বাবুর্চির দিকে চোখ তুলে তাকালো জেন। চোখে সন্দেহ। নিশ্চয় সব কিছুই পূর্ব-পরিকল্পিত। রোকোফের শয়তানী। এবং এতে জড়িত রয়েছে এনডারসন।

কিন্তু লোকটার চোখের দিকে চেয়ে বুঝলো জেন, এ-ব্যাপারে জানে না কিছু বাবুর্চি। তার চোখেও সত্যি সত্যি বিস্ময়।

'আমার ছেলে···আমার জ্যাক!' কাঁদছে জেন। 'নিশ্চয় জাহাজে রয়ে গেছে! ফিরে চলো, ওকে আনতে হবে!'

মাথা নাড়লো এনডারসন। 'কিনশেডে আর কোনো বাচ্চা নেই, আমি শিওর! অযথা ফিরে গিয়ে লাভ নেই। রোকোফ দুজনকেই খুন করবে!'

কি আর বলবে জেন? অন্যের শিশু কোলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলো। দাঁড় বেয়ে চলেছে এনডারসন। তাহলে কি মিথ্যে কথা বলেছে পলভিচ, ভাবছে জেন! বলেছে, জ্যাক আছে কিনশেডে। তবে একবারও জেনকে দেখায়নি বাচ্চাটা। এখন বুঝতে পারছে, কেন দেখায়নি। দেখালেই তো চিনে ফেলবে মা, এটা অন্যের বাচ্চা।

পলভিচ! আরেকটা শয়তান। নিশ্চয় জেনেশুনেই আরেকটা বাচ্চা এনে জাহাজে তুলেছিলো সে। রোকোফকে জানিয়েছিলো, ওটা জেনের বাচ্চা। নিশ্চয় কোনো রকম খেলা খেলছে পলভিচ, যার জন্যে রোকোফকেও ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু কি? রোকোফের হাতে নকল বাচ্চা তুলে দিয়ে আসলটা দিয়ে ব্ল্যাকমেল করবে

টারজানকে ?

অনেকগুলো 'কেন' এসে একসঙ্গে ভিড় জমিয়েছে জেনের মনে। কোনোটারই সদুত্তর পাচ্ছে না। জ্যাকই বা কোথায় আছে ? কোথায় রেখে এসেছে তাকে পলভিচ ?

দিনের পর দিন পেরোলো। গভীর থেকে গভীরতম বনে এসে ঢুকলো ওরা। জেনের কোলে অন্যের সন্তান। নৌকা থেকে নেমে পড়েছে। বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে তখন। সঙ্গে ছয়জন মসুলা কুলি। এই সময়ই অসুখে পড়লো বাচ্চাটা। সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি করেনি জেন। কিন্তু এই গহীন জঙ্গলে ওষুধ-পথ্য পাবে কোথায় সে ? অসুখ বাড়তেই লাগলো বাচ্চাটার।

ভয়ংকর সকালটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে এখনো। ঘুম থেকে উঠেই দেখলো জেন, মুখ কালো করে বসে আছে এনডারসন। কি ব্যাপার ? পালিয়েছে কুলিগুলো, জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছে। শুধু তাই না, পেছনে লেগেছে রোকোফ। পৌঁছে গেছে প্রায়। যে কোনো সময় তাদেরকে ধরে ফেলতে পারে।

ঘন একটা ঝোপ দেখিয়ে জেনকে ঢুকে যেতে বললো এনডারসন। এক বাক্স গুলি আর একটা রাইফেল রেখে নিজে আরেকদিকে হেঁটে চললো। ভুল পথে রোকোফকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ ঝোপের ভেতর বসে রইলো জেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো বাচ্চাটা। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। কেমন যেন ছট ফট করছে।

আতংকিত হয়ে পড়লো জেন। হোক না অন্যের বাচ্চা, তাকে বাঁচাতেই হবে। রোকোফের ভয় আর রইলো না। ছুটে বেরিয়ে এলো ঝোপের ভেতর থেকে। গত বিকেলে আসার সময় কাছেই অংলীদের একটা গ্রাম দেখে এসেছে, ছুটলো সেদিকে।

গ্রামটা খুঁজে পেলো জেন। ঢুকে পড়লো নির্দ্বিধায়। তাকে দেখে অবাক হলো গাঁয়ের লোক। কিন্তু কোনো ক্ষতি করলো না। এক বুড়ি এগিয়ে এলো। বাচ্চাটাকে দেখলো ভালোমতো। তারপর মাথা নাড়লো ধীরে ধীরে···আবার চেঁচিয়ে উঠলো বাচ্চাটা। কেঁপে উঠলো একবার থরথর করে। তারপর চুপ হয়ে গেল।

কান্নায় ফেটে পড়েছে জেন। মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়েছে তাকে বুড়ি।

বাচ্চাটা এখনো রয়েছে জেনের কোলে, কম্বলে জড়ানো, মৃত। দরদর করে গাল বেয়ে নামছে অশ্রুর ধারা। কিছুই করতে পারলো না সে শিশুটার জন্যে···রোকোফ! হ্যাঁ, শয়তান রোকোফই সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী···

গাঁয়ের বাইরে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে হট্টগোল, একসঙ্গে আসছে যেন অনেক মানুষ। দরজায় এসে দাঁড়ালো কে যেন! মুখ তুলে তাকালো জেন। স্তব্ধ হয়ে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নিকোলাস রোকোফ। কুৎসিত হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত।

জেনের মুখ থেকে রোকোফের চোখ গেল কম্বলে জড়ানো বাচ্চাটার দিকে। 'অযথা কষ্ট করেছো। এখানেই নিয়ে আসতাম আমি

ওকে। তবে ভালোই করেছো, কষ্ট বাঁচিয়ে দিয়েছো আমার। ধন্যবাদ।'

চুপ করে রইলো জেন।

'এখানেই নিয়ে আসতাম ওকে,' আবার বললো রোকোফ। 'সর্দার মগানউয়াজামের হাতে তুলে দেবার জন্যে। মানুষখেকো হিসেবে গড়ে তুলবে সে। আমার কাজটা করে দিয়েছো, সেজন্যে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার হাতে দাও ওকে। ওর সৎবাপের হাতে তুলে দিই।' কুৎসিত রহস্যময় একটা হাসি ফুটলো রোকোফের ঠোঁটে।

নীরবে বাচ্চাটাকে তুলে দিলো জেন। 'নাও। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার সব শয়তানীর বাইরে নিয়ে গেছেন ওকে!'

বলা মাত্রই দিয়ে দিলো? অবাক হলো রোকোফ। টান দিয়ে বাচ্চাটার ওপর থেকে কম্বল ফেলে দিলো। একনজরই যথেষ্ট। শক্ত হয়ে আসা বাচ্চাটাকে জেনের দিকে প্রায় ছুঁড়ে মারলো সে। লুফে নিলো জেন।

নিষ্ফল আক্রোশে বাতাসে ঘুসি মারতে লাগলো রোকোফ। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। হঠাৎ জেনের মুখের সামনে মুখ নিয়ে এলো। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'খুব হাসি পাচ্ছে, না? আমাকে খুব একখান সবক দিতে পেরেছো, ভাবছো? দেখাবো মজা! নিকোলাস রোকোফের সঙ্গে শয়তানী বের করে দেবো! বাচ্চাটাকে ইচ্ছে করে মেরে ফেলেছো তুমি, আমাকে ফাঁকি দেবার জন্যে। ঠিক আছে, বাচ্চাকে মানুষখেকো বানাতে পারলাম না, বাচ্চার

মাকে মানুষখেকোর বৌ বানাবো। আমার কাজ শেষ হলেই তোমাকে তুলে দেবো মানুষখেকোর হাতে।'

জ্বলন্ত চোখে জেনের দিকে তাকালো রোকোফ। কিন্তু হতাশ হলো। ভয় পাওয়াতে ব্যর্থ হয়েছে। আঘাত পেতে পেতে একটা বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে জেন, এখন কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না যেন তার।

আলতো একটা হাসি ফুটলো জেনের ঠোঁটে। ও ভাবছে অন্য কথা। বেচারা শিশুটাকে পিশাচ বানাতে পারেনি রোকোফ। তাছাড়া এটা জেনের নিজের ছেলে জ্যাক নয়, এটাও বুঝতে পারেনি শয়তানটা। কথাটা জানিয়ে চমকে দেবার কথা একবার ভাবলো জেন, তারপর আবার বাতিল করে দিলো ভাবনাটা। উচিত হবে না। কি করে বসবে পিশাচটা, কে জানে? হয়তো আবার ফিরে গিয়ে খুঁজে বের করবে জ্যাককে। নিয়ে আসবে এখানে।

খামোকা হুমকি দিচ্ছে না রোকোফ, বুঝতে পারছে জেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, তেমন কোনো ক্ষতি হবার আগেই আত্ম-হত্যা করবে সে। তবে সেটা পরের কথা। রাশানটার হাত থেকে ছাড়া পাবার সব রকম চেষ্টা করে দেখবে আগে। সুযোগ খুঁজবে পালিয়ে যাবার। যদিও সেটা অসম্ভব বলেই মনে হলো তার। চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভাগো, যাও এখান থেকে! ছেলেটাকে নিয়ে একা থাকতে দাও আমাকে! তোমার কি ক্ষতি আমি করেছি, আমাকে এভাবে ভোগাচ্ছো?'

'ভোগান্তি তো নিজেই টেনে এনেছো, বানরটাকে বিয়ে করে।' খিকখিক করে হাসলো রোকোফ। 'কিন্তু এখন আর ওসব বলে লাভ নেই। মরাটাকে পুঁতে ফেলা দরকার। তারপর আমার সঙ্গে আমার ক্যাম্পে যাচ্ছো তুমি। আজ রাতটা আমার সঙ্গে কাটাবে। আগামীকাল সকালে তোমার নতুন স্বামী সুদর্শন মগানউয়াজামের হাতে তুলে দেবো তোমাকে।'

হাত বাড়িয়ে জেনের কাছ থেকে শিশুটাকে নিতে গেল রোকোফ।'

ঝটকা দিয়ে সরে দাঁড়ালো জেন। 'আমি নিজে কবর দেবো। লোক পাঠাও, কবর খুঁড়ুক।'

শিকারকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে যেতে চায় রোকোফ। চলে গেল সে সেখান থেকে। খানিক পরেই ফিরে এলো আবার। সঙ্গে কয়েকটা জংলী। জেনকে বেরোতে বললো।

গাঁয়ের বাইরে একটা বড় গাছের গোড়ায় গর্ত খুঁড়লো জংলীরা। কম্বল জড়িয়ে শিশুটাকে আস্তে করে নামিয়ে রাখলো জেন। কেঁদে ফেললো আবার। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলো ঈশ্বরের কাছে। তারপর উঠে দাঁড়ালো। জ্বলন্ত চোখে তাকালো রোকোফের দিকে।

খপ করে জেনের হাত চেপে ধরলো রোকোফ। টেনে নিয়ে চললো অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

মাথার ওপরে ঘন পাতার চাঁদোয়া। ঢেকে দিয়েছে চাঁদের আলো। নিচে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আশেপাশে নিশাচর জীবের

আনাগোনা। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে সিংহ। গম্ভীর গর্জনে কেঁপে উঠছে মাটি, কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়।

আগেপিছে হাঁটছে কয়েকজন কুলি। হাতে টর্চ, আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছে এদিক ওদিক। মাংসাশী নিশাচর শ্বাপদকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা। আতংকিত হয়ে পড়েছে রোকোফ। জেনের হাতে চেপে বসেছে তার আঙুল।

জঙ্গলের এই অন্ধকার আর শব্দ জেনের পরিচিত। রোকোফের মতো ভয় পাচ্ছে না সে। তার ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছে আগেই, এক মানুষ-দেবতা। সিংহের গর্জনে চমকে উঠেছে বটে জেন, কিন্তু রোকোফের মতো আতংকিত হয়ে পড়েনি।

অবশেষে ক্যাম্পে এসে পৌঁছালো ওরা। জঙ্গলের একটুখানি খোলা জায়গায় বেশ কয়েকটা তাঁবু। তাঁবুর চারপাশে খুঁটি গেড়ে শুকনো পাতার বেড়া দিয়ে দিয়েছে কুলিরা। একে 'বমা' বলে ওরা।

বমার ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো রোকোফ। কেমন যেন থমথমে একটা ভাব! কারণটা জানা গেল শিগগিরই। পালিয়েছে কুলিরা। সঙ্গে নিয়ে গেছে খাবার-দাবার, রাইফেল, গোলাবারুদ। রেগে কাঁই হয়ে গেল রোকোফ। ঝাল মেটাতে লাগলো সঙ্গের কুলিদের ওপর। মেরেধরে, লাফঝাঁপ দিয়ে শান্ত হলো একটু। জেনের পাহারায় রয়েছে কিনশেডের দুজন শ্বেতাঙ্গ নাবিক।

হঠাৎ জেনের ওপর চোখ পড়লো রোকোফের। দুপদাপ পা ফেলে এগিয়ে এলো সে। খপ করে চেপে ধরলো একটা হাত,

প্রায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চললো মেয়েটাকে।

জেন বুঝলো, চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলো সে। কিছুতেই ঢুকতে চাইলো না তাঁবুর ভেতর। তাকালো নাবিকদের দিকে। হতাশ হলো। খুব মজা পাচ্ছে নাবিকেরা, মিটি-মিটি হাসছে।

বেশিক্ষণ টানাটানি করলো না রোকোফ। পশু হয়ে উঠেছে সে। জোরে জোরে চড়থাপ্পর মারতে লাগলো জেনকে। তারপর জোর করে দু'হাতে তাকে তুলে নিয়ে ঢুকে পড়লো তাঁবুতে।

আলো জ্বেলে দিলো এক নিগ্রো কিশোর। ধপাস করে জেনকে এনে দড়ির খাটিয়ায় ফেললো রোকোফ। তারপর ফিরে তাকালো কিশোরের দিকে। বেরিয়ে যেতে বললো ছেলেটাকে।

আড়চোখে দেখলো জেন, রোকোফের কোমরে বেল্টে ঝুলছে বড় একটা রিভলভার। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না সে। একটানে খাপ থেকে তুলে নিলো রিভলভারটা। গুলি করলো না। তাহলে শব্দ শুনে ছুটে আসবে কুলি আর নাবিকেরা। এক পশুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পড়বে গিয়ে একাধিক জানোয়ারের খপ্পরে। চমকে ছেলেটার দিক থেকে সরে মুখ ফিরিয়েছে রোকোফ। রিভলভারের বাঁটের প্রচণ্ড বাড়ি পড়লো তার কপালের মাঝখানে। টুঁ শব্দ করতে পারলো না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জেন। হাতে রিভলভার। এবার কি করবে? তাকালো একবার বাতিটার দিকে, চর্বি পুড়ে বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়াচ্ছে। দ্রুত ভাবনা চলেছে তার মাথায়। শত্রুর আড্ডায়

আনাগোনা। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে সিংহ। গম্ভীর গর্জনে কেঁপে উঠছে মাটি, কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়।

আগেপিছে হাঁটছে কয়েকজন কুলি। হাতে টর্চ, আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছে এদিক ওদিক। মাংসাশী নিশাচর শ্বাপদকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা। আতংকিত হয়ে পড়েছে রোকোফ। জেনের হাতে চেপে বসেছে তার আঙুল।

জঙ্গলের এই অন্ধকার আর শব্দ জেনের পরিচিত। রোকোফের মতো ভয় পাচ্ছে না সে। তার ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছে আগেই, এক মানুষ-দেবতা। সিংহের গর্জনে চমকে উঠেছে বটে জেন, কিন্তু রোকোফের মতো আতংকিত হয়ে পড়েনি।

অবশেষে ক্যাম্পে এসে পৌঁছালো ওরা। জঙ্গলের একটুখানি খোলা জায়গায় বেশ কয়েকটা তাঁবু। তাঁবুর চারপাশে খুঁটি গেড়ে শুকনো পাতার বেড়া দিয়ে দিয়েছে কুলিরা। একে 'বমা' বলে ওরা।

বমার ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো রোকোফ। কেমন যেন থমথমে একটা ভাব! কারণটা জানা গেল শিগগিরই। পালিয়েছে কুলিরা। সঙ্গে নিয়ে গেছে খাবার-দাবার, রাইফেল, গোলাবারুদ। রেগে কাঁই হয়ে গেল রোকোফ। ঝাল মেটাতে লাগলো সঙ্গের কুলিদের ওপর। মেরেধরে, লাফঝাঁপ দিয়ে শান্ত হলো একটু। জেনের পাহারায় রয়েছে কিনশেডের ছজন শ্বেতাঙ্গ নাবিক।

হঠাৎ জেনের ওপর চোখ পড়লো রোকোফের। হুপদাপ পা ফেলে এগিয়ে এলো সে। খপ করে চেপে ধরলো একটা হাত,

প্রায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চললো মেয়েটাকে।

জেন বুঝলো, চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলো সে। কিছুতেই ঢুকতে চাইলো না তাঁবুর ভেতর। তাকালো নাবিকদের দিকে। হতাশ হলো। খুব মজা পাচ্ছে নাবিকেরা, মিটি-মিটি হাসছে।

বেশিক্ষণ টানাটানি করলো না রোকোফ। পশু হয়ে উঠেছে সে। জোরে জোরে চড়থাপ্পর মারতে লাগলো জেনকে। তারপর জোর করে দু'হাতে তাকে তুলে নিয়ে ঢুকে পড়লো তাঁবুতে।

আলো জ্বেলে দিলো এক নিগ্রো কিশোর। ধপাস করে জেনকে এনে দড়ির খাটিয়ায় ফেললো রোকোফ। তারপর ফিরে তাকালো কিশোরের দিকে। বেরিয়ে যেতে বললো ছেলেটাকে।

আড়চোখে দেখলো জেন, রোকোফের কোমরে বেল্টে ঝুলছে বড় একটা রিভলভার। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না সে। একটানে খাপ থেকে তুলে নিলো রিভলভারটা। গুলি করলো না। তাহলে শব্দ শুনে ছুটে আসবে কুলি আর নাবিকেরা। এক পশুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পড়বে গিয়ে একাধিক জানোয়ারের খপ্পরে। চমকে ছেলেটার দিক থেকে সরে মুখ ফিরিয়েছে রোকোফ। রিভলভারের বাঁটের প্রচণ্ড বাড়ি পড়লো তার কপালের মাঝখানে। টুঁ শব্দ করতে পারলো না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জেন। হাতে রিভলভার। এবার কি করবে? তাকালো একবার বাতিটার দিকে, চর্বি পুড়ে বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়াচ্ছে। দ্রুত ভাবনা চলেছে তার মাথায়। শত্রুর আড্ডায়

রয়েছে। চারপাশে গভীর জঙ্গল। হিংস্র পশুর আনাগোনা ওখানে নিয়ত। কিন্তু মানুষ-পশুর চেয়ে ওরা অনেক ভালো।

ভাবছে জেন, হয়তো মারা যাবে জানোয়ারের কবলে পড়ে। মানুষের হাতে নির্যাতিত হয়ে মরার চেয়ে সে মৃত্যু অনেক ভালো। তাছাড়া, মরবেই, এমন কোন কথা নেই। অনেক বিপদ-আপদ তো পেরিয়ে এসেছে এ-যাবৎ। আরো বিপদ এড়াতে পারবে না, কে বলতে পারে? জ্যাকের কথা মনে পড়ে গেল। হয়তো এখন খিদেয় কাঁদছে বাচ্চাটা, কচি কচি হাত নেড়ে মা-কে খুঁজছে। না, আর দ্বিধা নয়। ছেলেকে খুঁজে বের করতেই হবে তাকে।

জেন দেখেছে, বমার ঘেরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে রোকোফের তাঁবু। ওটাকে ঘিরে খাটানো হয়েছে অন্য তাঁবুগুলো। বেরোতে গেলে কারো না কারো চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু উপায় নেই।

দরজার দিকে গেল না জেন। তাঁবুর এক প্রান্তে চলে এলো। নিচের দিকের কানা ধরে টান দিলো আস্তে করে। উঠছে না। শক্ত করে আটকানো রয়েছে খুঁটিতে। দ্রুত আবার খাটিয়ার কাছে ফিরে এলো সে। মাটিতে পড়ে থাকা রোকোফের কোমরের খাপ থেকে খুলে নিলো বড় ছুরিটা। ওটা দিয়ে বড়সড় একটা ফোকর করে ফেললো তাঁবুর কাপড় কেটে। নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এলো ওপথে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো জেন। তাঁবুর বাইরে লোকজন নেই। নীরব। নিশ্চয় যার যার তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়েছে নাবিক আর

কুলিরা। নিভুনিভু হয়ে এসেছে আগুনের কুণ্ড। ধারে বসে রাইফেল হাতে ঢুলছে এক কৃষ্ণাঙ্গ কুলি।

লোকটার ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে থাকলো জেন। দুটো তাঁবুর মাঝ দিয়ে এসে দাঁড়ালো বমার কাছে। শুকনো পাতা। বেশি টানাহেঁচড়া করলে শব্দ হয়ে যাবে। আস্তে করে পাতা ফাঁক করলো জেন। এদিকে পেছনে করে বসা প্রহরীর দিকে আরেকবার তাকিয়েই বেরিয়ে চলে এলো বমার বাইরে।

ঘন কালো অন্ধকার। লতানো ঝোপঝাড় আর গাছপালার ভেতর থেকে ভেসে আসছে সিংহের গর্জন, হায়েনার অট্টহাসি আর অন্যান্য হাজারো প্রাণীর হাজারো রকম ডাক, শব্দ, চিৎকার।

কাঁপছে জেন। উত্তেজনা আর ভয়ে। দেখার চেষ্টা করলো জানোয়ারগুলোকে। কিন্তু আঁধারের পর্দা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা ঝাড়া দিয়ে সাহস সঞ্চয় করে নিলো। সামনে মৃত্যু, পেছনেও তাই। যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। জন্তুজানোয়ারের কবলে মরার সিদ্ধান্ত নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো সে। ছুটে চললো ঘন বনের ভেতর দিয়ে। রোকোফের ক্যাম্প থেকে দূরে আরো দূরে···

দশ

পথ দেখিয়ে রোকোফের তাঁবুতে টারজানকে নিয়ে চলেছে তাম্বুজা। বুনো পথ, এমনিতেই দ্রুত চলা যায় না। তার ওপর বয়েস হয়েছে, চলতে খুব অসুবিধে হচ্ছে তার। তবু থামছে না। বাতে প্রায় অসাড় দুর্বল পা দুটো টেনে টেনে কোনোমতে এগিয়ে চলেছে সে।

অনেক দ্রুত এগোচ্ছে মগানউয়াজামের দুই দূত। টারজান আর তাম্বুজা অর্ধেক পথ পেরোনোর আগেই রোকোফের তাঁবুতে পৌঁছে গেল ওরা।

রক্তাক্ত বেহুঁশ অবস্থায় রোকোফকে পাওয়া গেল তার তাঁবুতে। পানি ঢেলে বাতাস করে হুঁশ ফেরানো হলো তার। উঠে বসলো সে। যখন জানলো, জেন পালিয়েছে, রাগে পাগল হয়ে উঠলো।

ছুটে গিয়ে থাবা দিয়ে রাইফেল তুলে নিলো রোকোফ। গুলি করে মারলো প্রহরীকে। তারপর ঘুরলো অন্যদের দিকে। শংকিত হয়ে পড়লো শ্বেতাঙ্গ নাবিকেরা। ওরা বুঝলো, রোকোফের ক্রোধ ওদের ওপরও এসে পড়তে পারে। জোর করে খেপা লোকটার হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিলো ওরা।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতোই সামনে এসে দাঁড়ালো মগাউয়াজামের দুই দূত। জানালো দুঃসংবাদ। বললো, এতোক্ষণে নিশ্চয় কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়েছে শাদা দানবটা। আসছে এদিকেই।

সঙ্গে সঙ্গে হুলুস্থুল পড়ে গেল পুরো ক্যাম্পে। শাদা দানবের নাম শুনে আতংকিত হয়ে পড়লো কালো কুলিরা। রোমশ একদল অপদেবতা নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় শাদা দানব, গুজব শুনেছে ওরা। এখন যখন জানলো, গুজবটা সত্যি, আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না ওদেরকে।

শ্বেতাঙ্গরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই পালালো কালোরা। তাড়াহুড়ার মাঝেও মূল্যবান জিনিসপত্র হাতের কাছে যা পেলো, হাতিয়ে নিতে ভুললো না। মগানউয়াজামের দূতেরাও দাঁড়িয়ে রইলো না। রোকোফকে খবরটা দিয়েই ঝোপে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোকোফ আর তার সাত নাবিক। মালপত্র বেশির ভাগই লুটপাট হয়ে গেছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কেউ নেই।

অবশেষে চেঁচিয়ে উঠলো রোকোফ। স্বভাবমাফিক সমস্ত দোষ চাপালো অন্যের ওপর। সামনে কালোরা কেউ নেই, নাবিকদেরই গালমন্দ করতে শুরু করলো সে। তার যেন কোনো দোষ নেই, একেবারে দুধে ধোয়া সাধুপুরুষ। সবারই জীবন সমান বিপন্ন, তাই নাবিকেরা গালমন্দ মুখ বুজে হজম করলো না। রেগে গেল ওরাও।

কোমর থেকে টান দিয়ে রিভলভার খুলে নিলো এক নাবিক।

তুলেই গুলি চালালো। তাড়াহুড়োয় নিশানা ঠিক রাখতে পারলো না। তাছাড়া ডাইভ দিয়েছে রোকোফ। গুলি ফসকে গেল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনোমতে উঠে পড়লো আতংকিত রোকোফ। ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লো তার তাঁবুতে। কিন্তু তার আগেই চোখ পড়েছে আগুনের ওপাশে। প্রায় উলঙ্গ এক দানবীয় শাদা দেহ ধীরে ধীরে এসে ঢুকছে দরজা দিয়ে। ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার হাত-পা। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। শুকিয়ে গেছে গলা, জিহ্বা, ঠোঁট।

কি করবে সিদ্ধান্ত নেবার আগেই রোকোফের চোখ পড়লো ফোকরটার দিকে, যেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে জেন। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ছুটে গেল সে। মাথা ঢুকিয়ে দিলো ফোকরে।

ভীত খরগোশের মতো আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে ফোকর গলে ওপাশে বের করে নিলো শরীরটাকে রোকোফ। ছুটে ঢুকে পড়লো বনের ভেতরে।

বুড়ি তাম্বুজার হাত ধরে টেনে নিয়ে বনার ভেতরে ঢুকে পড়লো টারজান।

শব্দ শুনে ফিরে তাকালো সাত নাবিক। টারজানকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তাদের।

এগিয়ে এলো টারজান। রোকোফকে চোখে পড়লো না।

টারজানকে দেখেই এদিক ওদিক ছুট লাগালো সাত শ্বেতাঙ্গ। বনার পাতা ফাঁক করে বেরিয়ে চলে গেল। ঢুকে পড়লো জঙ্গলে।

কিছু বললো না টারজান। শয়তানীর শাস্তি ওরা পাবে। ভয়ানক জঙ্গলে টিকতে পারবে না চব্বিশ ঘন্টাও। অহেতুক ওদের পেছনে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

কয়েকটা তাঁবুতে রোকোফকে খোঁজাখুঁজি করলো টারজান। পেলো না। অবশেষে এসে ঢুকলো বড় তাঁবুটাতে। থমকে দাঁড়ালো। দুটো গন্ধ। একটা নিঃসন্দেহে রোকোফ, আরেকটা··· আরেকটা মেয়েলী···জেন! এদিক ওদিক চেয়ে ফোকরটা চোখে পড়লো তার। ছুটে গেল। গন্ধ শুঁকলো। না, আর কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় এদিক দিয়ে জেনকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে রোকোফ।

তাম্বুজার দিকে ফিরে তাকালো টারজান। 'তুমি একা গাঁয়ে ফিরতে পারবে?'

'পারবো। তুমি যাও। খুঁজে বের করো ওদের। সকাল হলে যাবো আমি।'

'পারবে তো? নাকি পৌঁছে দিয়ে আসবো?'

'খামোকা ভাবছো, বাওয়ানা। জঙ্গলে জন্মেছি আমি, বুড়ি হয়েছি, রাতের অন্ধকারে পথ দেখিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি। দিনের আলোয় ফিরে যেতে পারবো না?'

'বেশ, শান্তিতে থেকো তুমি,' জংলীদের মতো করে শুভেচ্ছা জানালো টারজান।

'শান্তিতে থেকো, বাওয়ানা।'

আর দেরি করলো না টারজান। ফোকর গলে বেরিয়ে চলে এলো। ঢুকে পড়লো জঙ্গলে।

সরু বুনো পথ ধরে ছুটে চলেছে ভীত-চকিত জেন। ভোর হয়ে এসেছে। আলো ফুটছে দ্রুত। নিশাচর জীবেরা ফিরে চলেছে যার যার ডেরায়।

টারজানের সঙ্গে বনে বাস করে অনেক কিছু শিখে নিয়েছে জেন। পথের ওপর জন্তুজানোয়ারের পায়ের অসংখ্য ছাপ। তার-মানে এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে একসময় না একসময় পৌঁছে যাবে নদীর ধারে, যেখান দিয়ে পানি খেতে যায় ওরা।

অনেক অসম্ভব ঘটনাও ঘটে যায় মাঝে মাঝে। জেনের বেলায়ও ঘটলো। ছুটতে ছুটতে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালো সে। চেনা জায়গা। বড় একটা গাছের পাশে ঘন একটা ঝোপ। ওই ঝোপের ভেতরেই তাকে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলো এনডারসন। ঝোপটা দেখেই হাতের রিভলভারের কথা মনে পড়লো জেনের। মাত্র ছ'টা গুলি আছে এতে। ভয়ানক শ্বাপদ-সংকুল জঙ্গলে এই কটা গুলি আর কতোক্ষণ? ঝোপের ভেতরে উঁকি দিলো সে। তেমনি পড়ে আছে রাইফেল আর গুলির বাক্স। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো সে ওগুলো। ভারি রাইফেল অনেকখানি ভরসা ফিরিয়ে আনলো তার মনে। যাক, গুলি যখন আছে, ঠেকাতে পারবে হিংস্র জানোয়ারকে।

আবার ছুটে চললো জেন।

একই পথ ধরে ছুটে চলেছে আরেকজন। নিকোলাস রোকোফ। কল্পনাও করছে না, তার আগে আগে চলেছে জেন। ওসব ভাবার সময়ও এখন নেই তার। প্রাণের ভয়ে ছুটছে। কোথায় কোনদিকে

যাচ্ছে, কোনো হদিস নেই। একমাত্র চিন্তা, যে করেই হোক পালিয়ে যেতে হবে শাদা মৃত্যুর হাত থেকে। টারজানের হাতে পড়লে খালি হাতেই টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। কাজেই পালাতে হবে। আর কোনো উপায় নেই।

ছুটতে ছুটতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো জেন। সামনের দিকে চেয়েই চট করে ঢুকে পড়লো পাশের একটা বড় ঝোপে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা বড় জানোয়ার।

পথের ওপর এসে দাঁড়ালো জানোয়ারটা। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উবু হয়ে মাটি শুঁকলো। নিশ্চয় পিছু নিয়েছে কোনো কিছুর। জীবটা জেনের চেনা। বনমানুষ। ওটা বড় জোর ডজনখানেক পা এগিয়েছে, বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আরেকটা। তারপর আরেকটা। একে একে পাঁচটা বনমানুষ বেরিয়ে এলো। রাইফেলটা আঁকড়ে চুপচাপ বসে রইলো জেন।

পথের ওপরে এক জায়গায় জড়ো হলো বনমানুষগুলো। বার বার পেছনে তাকাচ্ছে। আরো কিছুর বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করছে যেন।

সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে জেনের। বনমানুষগুলো যায় না কেন এখনো? বাতাস বইছে উল্টো দিক থেকে, তাই তার গায়ের গন্ধ পায়নি ওরা। এদিক থেকে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেলেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যাবে ওরা ওর উপস্থিতি। তারপর কি ঘটবে, আর ভাবতে চাইলো না সে।

বনমানুষগুলো যেদিক থেকে বেরিয়েছে, সেদিকে চেয়েই স্থির হয়ে গেল জেন। ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে উঁকি দিয়েছে একটা কালো মাথা। সাপের মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো মাথার মালিক। বিশাল এক চিতাবাঘ। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো পথ ধরে।

এইবার বাঁধবে লড়াই! দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে রইলো জেন। আশ্চর্য! চিতাটা এসে দাঁড়িয়ে পড়লো বনমানুষগুলোর কাছে। লড়াইয়ের কোনো লক্ষণই নেই। আগের পরিচিত ওরা? কয়েক মুহূর্ত পরেই আরো অবাক হবার পালা তার। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একজন মানুষ, কাফ্রী।

আঁতকে উঠলো জেন। মানুষটার এতো দুঃসাহস! এগিয়ে আসছে! চোখের পলকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওকে জানোয়ারগুলো!

কিন্তু কিছুই ঘটলো না। তাজ্জব হয়ে দেখলো জেন, এগিয়ে এসে কি যেন বললো লোকটা। নীরবে আদেশ পালন করলো জানোয়ারগুলো। হেঁটে চলে গেল সামনে দিয়ে, জেন যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে।

হাঁপ ছাড়লো জেন। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে এলো ঝোপের ভেতর থেকে। এগোলো আবার নদীর উদ্দেশে।

জেনের কাছ থেকে আধ মাইল দূরে বিরাট একটা পিঁপড়ের ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে আছে একজন লোক। ভয়ে কাঁপছে থরথর করে।

টিবিটার সামনে দিয়েই চলে যাচ্ছে ভয়ংকর দর্শন প্রাণীগুলো। ওদেরকে আদেশ দিচ্ছে একজন কাফ্রী।

ধীরে ধীরে সামনে দিয়ে চলে গেল দলটা। রোকোফ বুঝতে পারলো, ওরা টারজানের খোঁজে যাচ্ছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো সে টিবির আড়াল থেকে। পড়িমড়ি করে ছুটতে শুরু করলো উল্টোদিকে।

নদীর পাড়ে বেরিয়ে এলো জেন। একটু দূরে একটা ক্যানো ভাসছে, নিশ্চয় কাছাকাছিই কোথাও জংলীদের গ্রাম।

পা টিপে টিপে নৌকাটার দিকে এগোলো জেন। স্রোতে ভাসিয়ে এগিয়ে গেলে আপনা-আপনি সাগরে বেরিয়ে পড়বে ক্যানো। তারপর দেখা যাবে, কি করা যায়।

ঢালু তীর বেয়ে নেমে পানির কাছাকাছি চলে এলো জেন। এই সময় পেছনে শব্দ হলো। চমকে উঠে ফিরে তাকালো সে। ধড়াস করে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারলো হৃৎপিণ্ডটা। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নিকোলাস রোকোফ!

লাফিয়ে এসে নৌকায় উঠে পড়লো জেন। আরেকটু হলেই দিয়েছিলো উল্টে। দাঁড়টা পড়ে আছে পাটাতনে। তাড়াতাড়ি ওটা হাতে তুলে নিলো সে। পেছনে শোনা গেল রোকোফের চিৎকার। ছুটে আসছে সে।

দাঁড় বেয়ে দ্রুত নৌকাটাকে গভীর পানিতে সরিয়ে নেবার চেষ্টা চালালো জেন। স্রোতের জন্যে সুবিধে করতে পারছে না, টেনে

পাশে ঘুরিয়ে ফেলতে চাইছে। আশ্চর্য তো! স্রোতের এহেন ব্যবহারের কথা সে জানে না।

পৌঁছে গেছে রোকোফ। লাফ দিয়ে নেমে পড়লো পানিতে। নৌকার গলুই ধরে ধরে প্রায়। এই সময় সরে এলো নৌকাটা। কিন্তু স্রোতের গতির সঙ্গে নৌকা যেন তাল মেলাতে পারছে না। আবার সেই পিছু টান!

থেমে গেল নৌকা। অবাক হয়ে পানির দিকে তাকালো জেন। কোনো কিছুতে ঠেকে গেল তলা? ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে শুরু করলো। হঠাৎ বুঝে গেল ব্যাপারটা জেন। পেছনে ফিরে তাকালো।

ঠিকই। দড়ি ধরে টানছে রোকোফ। লম্বা দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিলো নৌকাটা। তাড়াহুড়ায় খেয়াল করেনি জেন। দড়ি খোলার কথা মনে ছিলো না, এখন আর সময় নেই।

কুৎসিত হাসিতে ভরে গেছে রোকোফের মুখ।

এগারো

পথেই দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টারজানের। থামলো না সে। দলবল নিয়ে মুগাম্বিকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে ছুটে চললো রোকোফ আর জেনের চিহ্ন ধরে। অনেক আগেই ধরে ফেলতো ওদের, পারেনি একটা কারণে। তাঁবুর একই ফোকর দিয়ে বেরিয়ে বনে ঢুকেছে দুজনে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে এগিয়েছে। দুদিক থেকে অনেকখানি ঘুরে আবার এসে উঠেছে পথে। এরপর থেকে একই পথ ধরে এগিয়েছে ওরা। শুরুতে দুজনের চিহ্ন দু'-দিকে খুঁজতে হয়েছে, নষ্ট হয়েছে সময়। দ্বিগুণ গতিতে ছুটে সেটা পুষিয়ে নিতে চাইছে এখন টারজান।

ছুটতে ছুটতেই বেরিয়ে এলো নদীর পাড়ে। দ্রুত একবার চোখ বোলালো উজানের দিকে। নেই। ভাটির দিকে তাকালো। মোড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ক্যানোটা। এদিকে পেছন করে বসে আছে একজন লোক। নিশ্চয় নিকোলাস রোকোফ।

নদীর তীর ধরে ছুটতে শুরু করলো টারজান। কোথাও ঘন ঝোপ-ঝাড় পানির ওপরে নেমে এসেছে, কোথাও বড় বড় গর্ত, কোথাও

বা কাদা। জোরে ছুটতে খুব অসুবিধে হচ্ছে, গতি কমাতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই। সব চেয়ে ভয়ংকর ওই কাদা। ওপর থেকে দেখে মনে হবে কিছুই না, কিন্তু মাঝে মাঝে রয়েছে চোরাকাদা। একেবারে মৃত্যু ফাঁদ। গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। তলিয়ে যাবে। বাইরের কারো সাহায্য ছাড়া ওই মারাত্মক চোরাকাদা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই।

পেছনে চিৎকার শুনে একবার ফিরে তাকালো টারজান। বেরিয়ে এসেছে মুগাম্বি আর তার দল। ওদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে আবার ছুটতে শুরু করলো সে।

অবশেষে মোড়টা ঘুরলো। সামনে আরেকটা মোড়। ওটা ঘুরেই চোখে পড়লো ক্যানোটা। দ্রুত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তীব্র স্রোত। ক্যানোতে একজন মাত্র লোক। নিকোলাস রোকোফ জেন নেই নৌকায়।

ভয়ংকর গলায় চেঁচিয়ে উঠলো টারজান। শত্রুর দেখা পেয়েছে। টেনে টেনে ছিঁড়বে এবার তাকে। ঝপাং করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। সাঁতরে ধরে ফেলবে ক্যানোটা।

চমকে ফিরে তাকালো রোকোফ। আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠেছে শাদা দানবটা। কেঁপে উঠলো সে।

পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে টারজান। ত্বরতর করে সাঁতরে এগিয়ে আসছে। শিগগিরই ধরে ফেলবে ক্যানোটা। দাঁড় দিয়ে প্রাণপণে পানিতে খোঁচা মারতে লাগলো রোকোফ। স্রোতের টান, তার ওপর দাঁড়, দ্রুত এগোচ্ছে নৌকা। কিন্তু তবু টারজানের সঙ্গে

পারবে না। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ভাবলো একবার রোকোফ। পরক্ষণেই বাতিল করে দিলো চিন্তাটা। তাহলে আরো আগেই তাকে ধরে ফেলবে টারজান। চুবিয়ে মারবে। নাহ্, আর কোনো উপায়ই নেই বাঁচার। ঠিক এই সময় ওটা চোখে পড়লো তার।

টারজানের ঠিক পেছনেই নিঃশব্দে পানির ওপরে ভেসে উঠলো বিরাট মাথাটা। তারপরই ডুব দিলো আবার। কুমির।

কাছে এসে পড়েছে টারজান। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো ক্যানোর একটা ধার। উঠতে যাবে, ঠিক এই সময় পায়ে কামড়ে ধরলো ছুটো কঠিন চোয়াল।

এক পাশে কাত হয়ে গেল ক্যানোটা। উল্টে যাবে। দাঁড় তুলে ঘুরিয়েই টারজানের মাথায় বাড়ি মারলো রোকোফ। নৌকা থেকে হাত ছুটে গেল শত্রুর।

রোকোফ দেখলো, তোলপাড় উঠেছে পানিতে। পরক্ষণেই জোর টানে ডুবে গেল টারজানের মাথা।

আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠলো রোকোফ। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচেছে। ধপাস করে পাটাতনের ওপরই বসে পড়লো সে।

স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে ক্যানো। চুপচাপ শুয়ে আছে রোকোফ। বিশ্রাম নিচ্ছে। আর কিছুই করার নেই তার। খিদে পেলে জংলীদের কোনো একটা গাঁয়ে নেমে খাবার জোগাড় করে নেবে।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা গর্জনে চমকে উঠে বসলো রোকোফ। নদীর

তীর ধরে ছুটছে একটা দল। সেই বনমানুষগুলো, কালো চিতা আর কালো মানুষটা। টারজানের দল। ওরা তাকে ছাড়বে না, বুঝতে পারলো রোকোফ। তীরে নেমে খাবার জোগাড়ের আশা শেষ।

ছুটে চলেছে ক্যানো। সামনে কোথাও দেখা যাচ্ছে না জেন ক্লেটনকে। তার কথা মনে পড়তেই তেতো হয়ে গেল রোকোফের মন। সাধারণ একটা মেয়ে বার বার ঘোলা পানি খাওয়াচ্ছে তাকে, পেরে উঠছে না সে কিছুতেই।

দড়ি ধরে ক্যানোটাকে টেনে আনার সময় খুব খুশি হয়েছিলো রোকোফ। ভেবেছিলো, এইবার আর ছাড়া পাবে না জেন। কিন্তু ঠিকই পেয়ে গেল।

ক্যানোটা তীরের কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ নড়ে উঠলো জেন। হাত তুললো। আতংকিত হয়ে দেখলো রোকোফ, তার দিকে চেয়ে আছে একটা রিভলভারের কালো নল। তারই অস্ত্র। যেটা ছিনিয়ে নিয়েছিলো জেন।

বাধ্য হয়েই দড়ি ছেড়ে দিতে হলো রোকোফকে। ছুরি দিয়ে দড়িটা কেটে দিলো জেন। স্রোতের টানে ছুটে চললো নৌকা। দেখতে দেখতে চলে গেল রোকোফের নাগালের বাইরে।

খুঁজেপেতে আরেকটা ক্যানো জোগাড় করে নিয়েছে রোকোফ সেটাতেই রয়েছে এখন।

ছুটে চলেছে ক্যানো। যতোই ভাটির দিকে যাচ্ছে, বাড়ছে গতি। তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উজান বেয়ে আসতে যেখানে

একদিন লেগে যায়, সে পথ দুই-আড়াই ঘন্টায়ই পেরিয়ে যাচ্ছে এখন।

দিন গেল, রাত নামলো। ভোর হলো আবার। সূর্য উঠলো। তীরের দিকে তাকালো রোকোফ। আছে, তবে পুরো দলটা নয়। বনমানুষদের নিয়ে নিশ্চয় পেছনে আসছে কালো মানুষটা। নৌকাকে অনুসরণ করে ছুটছে কালো চিতা।

বেলা বাড়ছে। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে রোকোফের পেট। আর সইতে পারছে না। সামনের যে কোনো একটা গাঁয়ে নেমে খাবার জোগাড় করতেই হবে। ইস্, একটা রাইফেল যদি থাকতো সঙ্গে। গুলি করে মেরে ফেলতে পারতো ভয়ংকর জানোয়ারটাকে।

কপাল ভালোই বলতে হবে রোকোফের। নদীর ঘাটে কয়েকটা ক্যানো দেখতে পেলো। নিশ্চয় জংলীদের গ্রাম! নদীর এই ভাটি অঞ্চলে মানুষখেকো নেই, আশা করলো সে। চিতাটা রয়েছে অন্য তীরে। এ-তীরে আসতে হলে কুমির আর তীব্র স্রোতের বাধা পেরিয়ে আসতে হবে। নিশ্চয় সে ঝুঁকি নেবে না জানোয়ারটা।

তীরে নামলো রোকোফ। গাঁ-টা খুঁজে বের করলো। ঠিকই অনুমান করেছে। মানুষখেকো নয় এখানকার জংলীরা। অনুনয়-বিনয় করলো রোকোফ। খাবার দিলো তাকে জংলীরা। ভরপেট খাওয়ার পর ঘুম এসে গেল তার। ঘুমিয়ে পড়লো জংলীদের একটা কুঁড়েতে।

ঘুম ভাঙলো সাঁঝের বেলা। অন্ধকারে আর ক্যানোতে উঠলো না সে। রাতটা জংলীদের কুঁড়েতেই কাটিয়ে দিলো। পরদিন

নিয়েই বরং দেখা যাক।

জাহাজের পাশে চলে এলো জেন। কিন্তু এমন নীরব কেন জাহাজটা? কেউ নেই?

পাশে ঝুলছে দড়ির সিঁড়ি। ওটা বেয়ে উঠে যেতে পারবে। নোঙরের শেকলের সঙ্গে ক্যানোর দড়ি বাঁধলো জেন। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে গেল দড়ির সিঁড়ি বেয়ে।

নির্জন ডেক। কেউ নেই। গেল কোথায় লোকগুলো?

হ্যাচের গর্তে ঢুকে পড়লো। সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে নেমে এলো নিচে। এক জায়গায় পড়ে আছে দু'জন নাবিক। না না, মৃত নয়। মদ খেয়ে বেহুঁশ। শিউরে উঠলো জেন। ওদের হাতে পড়লে কি অবস্থা হবে! তাড়াতাড়ি আবার উঠে এলো সে। আটকে দিলো হ্যাচ-কভার।

এরপর পুরো জাহাজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলো জেন। আর কেউ নেই জাহাজে, ওই দুজন মাতাল ছাড়া। ইতিমধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ডেকে এসে দাঁড়ালো আবার সে। নদীর দিকে চোখ পড়তেই সোজা হয়ে গেল। তাকালো তীক্ষ্ণ চোখে। আরেক-টা ক্যানো। একজন মাত্র মানুষ। রোকোফ, কোনো সন্দেহ নেই।

রেলিঙের পাশে ডেকে বসে রইলো জেন। শুনলো, জাহাজের গায়ে এসে ভিড়েছে ক্যানো। খানিকটা সময় দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো হঠাৎ। দড়ির সিঁড়ি ধরে উঠার উপক্রম করছে তখন রোকোফ।

রাইফেল তুলে রোকোফকে লক্ষ্য করলো জেন। ধমকে উঠলো, "ভাগো এখান থেকে।"

দড়ির সিঁড়ি ছেড়ে দিলো রোকোফ। বোকা হয়ে গেছে যেন। নির্লজ্জের মতো অনুনয়-বিনয় শুরু করলো। বললো, সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। আর কোনো ক্ষতি করবে না জেনের। তাকে যেন জাহাজে উঠতে দেয়া হয়।

রোকোফের কথায় কানই দিলো না জেন। আবার ধমকে উঠলো, 'ভাগো এখান থেকে! নইলে গুলি করবো!···বেশ, আমি দশ পর্যন্ত গুণছি। না গেলে এরপরই চালাবো গুলি। এক···দুই···'

'সাত' গুণতেই দাঁড় তুলে নিলো রোকোফ। মুখ খিস্তি করে জেনকে একটা গাল দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলো জাহাজের কাছ থেকে

মোহনার এক দিকের তীরে রয়েছে বনমানুষগুলো। সেদিকে গেল না সে। উল্টো তীরের দিকে চললো।

ডেকে দাঁড়িয়ে সব দেখতে পাচ্ছে জেন। দলটা অবাক করেছে তাকে। এমন কাণ্ড এর আগে কখনো দেখেনি। বনমানুষ, চিতা, মানুষ, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত দল। ওগুলোকেই বুনোপথে দেখেছিলো সে, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে এলো কেন ওরা? কাকে অনুসরণ করে এলো?

রোকোফের চিৎকারে ঘুরে তাকালো জেন। আরে! আরেকটা নৌকা! নিশ্চয় কিনশেডের বোট! নাবিকেরা আসছে! নিশ্চয় তীরে গিয়েছিলো কোনো কারণে, ফিরে আসছে।

দুরুদুরু করে উঠলো জেনের বুকের ভেতর। ঠেকাতে পারবে ওদেরকে? একটাই ভরসা, সে রয়েছে ওপরে। এখান থেকে গুলি করা সহজ তার জন্যে।

বারো

এখনো মাথা ঝিমঝিম করছে টারজানের। অন্য কোনো মানুষের মাথা হলে খুলি ফেটে গিয়ে ঘিলু বেরিয়ে যেতো। তার বিশেষ কিছুই হয়নি। পানির তলা দিয়ে ছুটে চলেছে। কামড়ে ধরে কোথাও নিয়ে চলেছে তাকে কুমিরটা।

এ-ধরনের বিপদে আগেও পড়েছে টারজান, মাথা গরম করলো না। ডুবে যাবার আগে শ্বাস নিয়েছে বুক ভরে। ছাড়া পাবার জন্যে জোরাজুরি শুরু করলো। পারলো না। পা-টা ভালোমতোই কামড়ে ধরেছে কুমির। প্রচণ্ড শক্তি দিয়েও দানবটার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলো না টারজান।

দম ফুরিয়ে আসছে। বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি শুরু হয়ে গেছে ফুসফুসের। এইবার ভয় পেতে শুরু করলো টারজান। দম একেবারে ফুরিয়ে যাবার আগেই ভেসে উঠতে না পারলে অক্সিজেনের অভাবেই মরবে।

পানি ঘোলা। কুমিরটাকে ভালোমতো দেখতে পাচ্ছে না ও। আবছামতো একটা ছায়া চোখে পড়ছে কেবল, বিশাল। হাত দিয়ে

ছুঁয়ে দেখলো, খসখসে চামড়া শাওলায় পিচ্ছিল।

আর পারছে না টারজান। দম ফুরিয়ে গেছে। ভয়ংকর চাপ অনুভূত হচ্ছে বুকে। ভোঁতা হয়ে আসছে চিন্তাশক্তি। এখুনি কিছু একটা করতে না পারলে আর কখনোই পারবে না। কোমর থেকে ছুরিটা খুলে হাতে নিলো। বার বার বসিয়ে দিতে লাগলো কুমিরের গায়ে। কোথায় লাগছে, বলতে পারবে না। হয়তো গলার নিচে কিংবা বুকের কাছাকাছি কোথাও হবে। কিন্তু কিছুই হলো না। সামান্যতম টললো না দানব। গতি শ্লথ হলো না এক বিন্দু। আগের মতোই টেনে নিয়ে চলেছে শিকারকে।

অবশ হয়ে গেছে টারজানের দেহ। মাথার ভেতরে প্রচণ্ড চাপ, বিস্ফোরিত হয়ে যাবে যেন। ঠিক এই সময় হুস্‌স্‌ করে পানির ওপরে ভেসে উঠলো মাথা। জোরে জোরে দম নিতে শুরু করলো টারজান।

ঘন কালো অন্ধকার। কোথায় ভেসে উঠলো কুমির? অনুভব করছে টারজান, নরম কাদায় টেনে তোলা হচ্ছে তাকে। কিন্তু এলো কোথায়!

পা ছেড়ে দিলো কুমির। খসখসে আঁশ আঁশ দেহটার গা ঘেঁষে পদ্মে থেকে হাঁপাচ্ছে টারজান।

তীব্র পঁচা গন্ধ গুহার বাতাসে। পাশাপাশি পড়ে আছে শিকার আর শিকারী। নড়তে ভয় পাচ্ছে টারজান। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কোন দিকে যাবে? নড়াচড়া করলে আবার কামড়ে ধরতে পারে কুমিরটা। কিন্তু কিছু একটা করা দরকার।

এভাবে পড়ে থাকলে হবে না।

হঠাৎ নড়ে উঠলো কুমিরটা। দাপাদাপি শুরু করলো। চুপ হয়ে গেল হঠাৎ। আর নড়ছে না। পড়ে রইলো টারজান। চুপ-চাপ। এক মিনিট···দুই মিনিট···তিন···নড়ে না কেন কুমির। আরো সময় গেল। তবু নড়ে না। হঠাৎ বুঝে গেল টারজান ব্যাপারটা। তার ছুরির খোঁচা মোক্ষম জায়গায় আঘাত হেনেছে। মারা গেছে কুমিরটা।

হাতেই ধরা রয়েছে ছুরি। উঠে বসে কোমরে গুঁজলো ওটা টারজান। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে সয়ে এসেছে অন্ধকার। আবছামতো দেখতে পাচ্ছে এখন গুহার ভেতরটা। অন্ধকার রাতে চিতার চোখের মতো কাজ করে টারজানের চোখ। কিন্তু এখানে রাতের চেয়ে অনেক অনেক বেশি অন্ধকার। এক বিন্দু আলো আসছে না কোনো দিক দিয়ে। অন্য কোনো মানুষ হলে কিছুই দেখতে পেতো না, কিন্তু সে পাচ্ছে।

বেশ বড় একটা গুহা। কুমিরের আস্তানা, কোনো সন্দেহ নেই। দশ থেকে পনেরোটা কুমির অনায়াসে থাকতে পারে এখানে। নিশ্চয় পানির অনেক তলায় রয়েছে গুহাটা, কোনোভাবে বাতাস আটকে আছে এখানে। এরকম থাকে। পানির তলার কোনো সুড়ঙ্গ পথ দিয়েই তাকে নিয়ে এখানে ঢুকেছে কুমিরটা। কিন্তু কোথায় সে সুড়ঙ্গ?

খুঁজে বের করতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে চলবে না। লম্বা করে দম নিয়ে পানিতে নামলো টারজান। বেশি খোঁজাখুঁজি

করতে হলো না। পেয়ে গেল সুড়ঙ্গমুখ। আবার ভেসে উঠলো সে। আবার দম নিয়ে ঢুকে পড়লো সুড়ঙ্গের ভেতর। নিশ্চয় অনেক বাঁক অনেক গলিঘুঁজি রয়েছে সুড়ঙ্গে। পথ হারিয়ে ফেললে সর্বনাশ। তবে সবচেয়ে বেশি ভয় আরেকটা দানবের মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার। বলা যায় না, সে যখন বেরোচ্ছে, সে সময় আরেকটা কুমির হয়তো এসে ঢুকছে। আর তাও যদি না হলো, ভেসে উঠে হয়তো সামনা-সামনি হয়ে যাবে কয়েকটার। কুমিরে কিলবিল করছে নদীটা।

ভাবছে, কিন্তু হাত পা থেমে নেই টারজানের। যতো জোরে সম্ভব, চালাচ্ছে। সুড়ঙ্গের দেয়ালে ধরে ধরে পথ ঠিক করে নিচ্ছে। হঠাৎ আর হাতে লাগলো না দেয়াল। বেরিয়ে চলে এসেছে সে। ওপরে উঠতে শুরু করলো। যে পা-টাতে কামড়ে ধরেছিলো কুমির, হাড় ভাঙেনি। গভীর হয়ে মাংসে দাঁত বসে গেছে। সাঁতরাতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। তবে ব্যথা করছে খুব।

ভেসে উঠলো শিগগিরই। পানির গভীরতা বেশি না এখানে। মাথা তুলেই চোখে পড়লো দ্রুত এগিয়ে আসছে দুটো কুমির। ধরে ফেললো বলে।

সাঁতরে ওদুটোর সঙ্গে পারবে না টারজান। মাথার ওপর ঝুলে আছে একটা গাছের ডাল। চট করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো। এক দোল দিয়ে উঠে গেল ওপরে। ঠিক সেই মুহূর্তে পায়ের তলায় সিন্দুকের ডালা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো একটা কুমিরের চোয়ালে চোয়ালে বাড়ি লেগে। রাগে ফুঁসে উঠলো দানবটা।

কিন্তু টারজান ততোক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে।

কয়েকটা মিনিট গাছের ওপর চুপচাপ বসে রইলো টারজান, বিশ্রাম নিলো। চোখ নদীর ভাটির দিকে। ক্যানো বা রোকোফের ছায়াও নেই।

গাছ থেকে নামলো টারজান। গাছের ছাল আর লতাপাতা জোগাড় করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো ক্ষতস্থানে। তারপর হাঁটতে শুরু করলো ভাটির দিকে, নদীর ধার ধরে ধরে।

ফুলে উঠেছে ক্ষতস্থান। ব্যথা বাড়ছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে টারজানের। গতি শ্লথ। গাছের ওপর দিয়ে চলা গেলে অনেক দ্রুত যাওয়া যেতো। কিন্তু পায়ের এই অবস্থা নিয়ে সেটা অসম্ভব, পারবেই না। গাছ থেকে ফসকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙার ভয় আছে। হাঁটা ছাড়া গতি নেই

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলেছে টারজান। ছুটতে পারছে না। মনে ভাবনা। জেন কোথায়? জ্যাক কোথায়? ওদের ক্ষতি যা করার তা কি করে ফেলেছে রোকোফ? নিজের অজান্তেই চাপা একটা গোঁ-গোঁ শব্দ গলা থেকে বেরিয়ে এলো টারজানের, ক্রুদ্ধ চিতার মতো।

রাশানটাকে একবার ধরতে পারলে হয়!

সামনে ছুটো গ্রাম পড়লো। একটা গ্রামের লোক তাকে দেখেই পালিয়ে গেল জঙ্গলে। আরেকটা গ্রামের লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এলো। দু'হাত মুখের ওপর এনে তার বুনোহাঁক ছাড়লো টারজান। আঁতকে উঠে ছুটে পালালো জংলীরা।

গতি ধীর, কিন্তু একনাগাড়ে এগিয়ে চলেছে টারজান। থামছে না। লক্ষ্য, মোহনা। নিশ্চয় মোহনাতেই চলেছে রোকোফ। সাগরে বেরিয়ে যাবে। ওখানে তার জাহাজটা অপেক্ষা করছে হয়তো।

অবশেষে এক রাতে মোহনার কাছে এসে পৌছুলো টারজান। ঘন কালো অন্ধকার। সামনে কয়েক গজের বেশি দেখতে পাচ্ছে না সে। পেছনে জঙ্গল, আশেপাশে জঙ্গল। সামনের দিকটা খোলা, সাগর!

হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো টারজানের। দাঁড়ের শব্দ। কান খাড়া করলো, কোনদিক থেকে আসছে, বোঝার চেষ্টা করছে।

আকাশে মেঘ। তারা নেই, চাঁদ অদৃশ্য। ফলে অন্ধকার জমাট। ঝড় আসবে নাকি?

হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে ক্ষণিকের জন্যে বেরিয়ে এলো চাঁদ।— জাহাজটা দেখতে পেলো টারজান। কিনশেড, কোনো সন্দেহ নেই। কানে এলো এক চটাস শব্দ। নিশ্চয় কাউকে চড় মেরেছে কেউ। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠলো একটা মেয়েকণ্ঠ।

জেন ক্লেটন!

পায়ের ব্যথা ভুলে গেল টারজান। চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধকার সাগরে। গ্রাস করে নিলো তাকে কালো পানি।

কিনশেডের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে জেন। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে, আসছে কিনা বোটটা।

দিনের বেলা রোকোফের চিৎকারে বোটটা গিয়ে ভিড়েছিলো

তীরে। নাবিকদের সঙ্গে কি শলা পরামর্শ হলো। তারপর সে-ও উঠে পড়লো বোটে। এগিয়ে আসতে শুরু করলো কিনশেডের দিকে। বোটটা অর্ধেক পথ আসতেই গুলি চালিয়েছে সে। পর পর দুজন নাবিককে মেরে ফেলার পর আর এগোতে সাহস করেনি ওরা। ফিরে গেছে আবার তীরে।

দিনের আলো থাকতে আর এগোতে সাহস করেনি ওরা। কিন্তু রাতের বেলা, এই অন্ধকারে যদি আসে, দেখতে পাবে না জেন। সতর্ক রয়েছে সেজন্যেই। যদি বোটের ছায়াও চোখে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাবে।

না, দেখা যাচ্ছে না বোটটা। তবে ওরা আসবেই, নিশ্চিত সে। রাত বাড়ার অপেক্ষা করছে হয়তো। এই সময়ই কথাটা মনে এলো তার। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন এখানে? নিচে আটকে রাখা নাবিক দুজনকে বের করে নিয়ে এলেই পারে। নোঙর তুলে জাহাজ নিয়ে সরে পড়বে। ভেসে পড়বে গভীর সাগরে। হয়তো অন্য কোনো জাহাজের নজরে পড়ে যেতে পারে কিনশেড। বেঁচে যাবে তাহলে। আর যদি না-ই বাঁচলো, রোকোফের হাতে পড়ে মরার চেয়ে অনেক ভালো সে মৃত্যু।

হ্যাচকভার খুলে ফেললো জেন। বসে নিচে উঁকি দিয়ে ডাকলো। সাড়া পাওয়া গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো দুই নাবিক। ওদের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে নোঙর তোলার আদেশ দিলো সে।

দ্বিধা করতে লাগলো ওরা। আবার ধমক দিলো জেন।

নোঙর তুলতে এগোলো নাবিকেরা।

উঠে গেল নোঙর। চলতে শুরু করলো জাহাজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো জেন।

এগিয়ে চলেছে কিনশেড। ক্যাপ্টেন নেই জাহাজে। অন্ধকারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না দুই নাবিক, কিংবা ইচ্ছে করেই করলো না।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি লাগলো হঠাৎ। কি হলো, কি হলো? বালির চরায় আটকে গেছে জাহাজের সামনের অংশের তলা। ছিটকে পড়তে পড়তে কোনোমতে সামলে নিলো জেন। কিনশেডকে চরা থেকে মুক্ত করে আনার নির্দেশ দিলো সে।

চেষ্টা চলেছে। কিন্তু চরা থেকে সরে আসছে না জাহাজ। হঠাৎ কানে এলো দাঁড়ের শব্দ। ফিরে তাকালো জেন। অন্ধকারে চোখ মেলে দেখার চেষ্টা চালালো কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না।

ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছে জেন। এই সুযোগে তার ঠিক পেছনে চলে এলো এক নাবিক।

জুতোর শব্দে চমকে ঘুরে তাকালো জেন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। খপ করে কব্জি চেপে ধরলো একটা কঠিন থাবা। চটাস করে চড় পড়লো গালে। চেঁচিয়ে উঠলো সে।

দ্রুত দাঁড় বাইছে মুগাম্বি। তার সঙ্গে তাল রাখার চেষ্টা করছে আকুত আর তার দল। কিনশেডের দিকে এগিয়ে চলেছে ক্যানো।

দিনের বেলা জাহাজের ডেকে মেয়েটাকে দেখেছে মুগাম্বি, শাদা মেয়ে। অনুমান করে নিয়েছে, ওকেই খোঁজার জন্যে বেরিয়েছিলো বনের রাজা টারজান।

আজব শাদা মানুষটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলো মুগাম্বি। তাকে মেরে ফেলেছে খারাপ শাদা মানুষটা। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে উয়াগাম্বি গাঁয়ের সর্দারের বুকে। শাদা মেয়েটাকে দেখে মনস্থির করে ফেললো, ওকে বাঁচাতে হবে। খতম করে দিতে হবে খারাপ শাদা মানুষটাকে। এবং সেজন্যে জাহাজে পৌঁছতে হবে তাকে। তারমানে একটা নৌকা দরকার।

দলবল নিয়ে আবার নদীর উজান ধরে চলে গেল মুগাম্বি একটা গাঁয়ে। তীরে বাঁধা একটা ক্যানো চুরি করতে কষ্ট হলো না। ওতে চড়ে বসেছে বনমানুষের দল আর শীতাকে নিয়ে।

জাহাজের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে ক্যানো। এই সময় মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ।

অন্ধকারে চুপিচুপি আরো একটা নৌকা এগিয়ে চলেছে জাহাজের দিকে। কিনশেডের বোট। ওতে করে চলেছে রোকোফ, পলভিচ আর কয়েকজন নাবিক। সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু অন্ধকারে তেমন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কে জানে, মেয়েটা দেখতে পাচ্ছে কিনা ওদেরকে, ভাবছে রোকোফ। তাহলে গুলি চালাবে নির্দ্বিধায়। দিনের বেলা যেমন চালিয়েছিলো।

আরো আগেই পৌঁছে যেতো ওরা কিনশেডে। কিন্তু একটু আগে চলতে শুরু করেছিলো জাহাজ। খানিক পরেই নিস্তব্ধতা। নিশ্চয় কোনো কারণে আবার থেমে পড়েছে জাহাজটা। আরো পরে শোনা গেছে মেয়েমানুষের চিৎকার। সেই শব্দ লক্ষ্য করেই এগিয়ে চলেছে ওরা এখন।

তেরো

সাঁতরে চলেছে টারজান। কানে আসছে দুটো ক্যানোর দাঁড় বাওয়ার মৃদু ক্যাঁচকোঁচ, ছলছলাৎ। সামনে বিশাল এক আবছা ছায়া। জাহাজ।

নদী থেকে বেরিয়ে সাগরে আসে না কুমির। নোনাপানিতে বাস করতে পারে না। কাজেই ওসবের ভয় নেই। তবে হাঙর থাকতে পারে। দুই দুইবার দুটো পিচ্ছিল দেহ গা ঘেঁষে চলে গেছে টারজানের। কি প্রাণী ওগুলো, বলতে পারবে না সে। তবে হাঙর হলে সর্বনাশ। কুমিরের মুখ থেকে ছাড়া পেয়েছে, হাঙর আক্রমণ করলে আর রেহাই নেই। কিন্তু ওসব ভেবে লাভ নেই এখন। যতো তাড়াতাড়ি গিয়ে জাহাজে উঠে পড়া যায়, সেটাই লক্ষ্য।

জাহাজের পাশে চলে এলো টারজান। বালির চরায় আটকে আছে কিনশেড। সে উঠবে কোনদিক দিয়ে? পাশ ধরে সাঁতরে এগোতেই দড়িটা ঠেকলো গায়ে। দড়ির সিঁড়ি। তরতর করে উঠে চলে এলো সে।

জাহাজের ডেকের আরেক পাশে ধস্তাধস্তি করছে দুজন লোক আর একটা মেয়ে।

নিঃশব্দে মাঝের দূরত্বটুকু অতিক্রম করে গেল টারজান।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ, তবে পুরোপুরি নয়। হালকা মেঘের একটা আস্তরণ রয়ে গেছে ওপরে। ফলে উজ্জ্বল জোৎস্না ছড়াতে পারছে না। কেমন আবছা এক ধরনের ভৌতিক আলো।

জেনকে চিনতে মোটেই ভুল হলো না টারজানের। কাঁধে হাত রাখলো এক নাবিকের।

চমকে উঠে পাঁই করে ঘুরলো লোকটা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শূন্যে উঠে গেল। উড়ে গিয়ে পড়লো দশ হাত তফাতে। তার পর পরই পাশে এসে পড়লো তার সঙ্গী। বালির বস্তার মতো ধপাস করে আছড়ে পড়েছে দুজনে।

উঠে দাঁড়িয়েছে জেন। 'টারজান!'

জেনকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে টারজান। তার বুকে মুখ রেখে ফোঁপাচ্ছে জেন। অন্য কোনোদিকে খেয়াল নেই ওদের। নইলে টারজান অন্তত শুনতে পেতো শব্দটা। ডেকে উঠে এসেছে কয়েকজন লোক।

'বেশ, বেশ!' পেছনে শোনা গেল রোকোফের গলা। 'দুজনকে একই জায়গায় পাওয়া গেল!'

জেনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো টারজান।

রাইফেল হাতে এগিয়ে আসছে রোকোফ। পেছনে একদল নাবিক। সবার হাতে রাইফেল।

'পেছনে তাকাও, রোকোফ,' শান্ত গলায় বললো টারজান।

'চুপ! ফাঁকি···' বলতে বলতেই থেমে গেল রোকোফ। পেছনে অদ্ভুত একটা শব্দ। পাঁই করে ঘুরলো সে। ডেক-এ উঠে আসছে বিকটদর্শন কয়েকটা জীব।

শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি। জেনকে ধাক্কা দিয়ে ডেক-এ ফেলে ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো টারজান। শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই!

খুব বেশিক্ষণ লাগলো না। টারজানের ছুরি, মুগাম্বির বল্লম, বনমানুষ আর শীতার ধারালো দাঁত-নখের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হতে লাগলো নাবিকেরা। শিগগিরই যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে হুড়মুড় করে হ্যাচের গর্ত দিয়ে নেমে পড়লো যারা বেঁচে রয়েছে। মোটমাট চারজন নাবিক।

রোকোফ করেছে বোকামি। সে চলে যেতে চেয়েছে রেলিঙের ধারে। পানিতে ঝাঁপ দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পারলো না। ঘিরে ফেললো তাকে আকুতের দল আর শীতা। কোণঠাসা করে ফেললো।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে রোকোফ, এগিয়ে যাচ্ছে শীতা। চাঁদের আলোয় ভয়ংকর দেখাচ্ছে চিতাটাকে। হাঁ করা মুখে মারাত্মক দাঁতগুলো চমকাচ্ছে। লকলকে জিভ বেরিয়ে পড়েছে। চাপা ঘড়ঘড় একটা শব্দ বেরোচ্ছে শীতার মুখ থেকে।

কেঁদে উঠলো রোকোফ। হাতজোড় করে অনুনয়-বিনয় করতে

লাগলো। বসে পড়লো হাঁটু মুড়ে। চিতাটার কাছে, না টারজানের কাছে মাফ চাইছে, বোঝা যাচ্ছে না।

ধাক্কা দিয়ে আকুত আর তার দলকে সরিয়ে দিলো টারজান। রাগে জ্বলছে। এগিয়ে গেল রোকোফের দিকে প্রতিশোধ নেবে সে নিজের হাতে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে শয়তানটাকে। আঙুলগুলো একবার মুঠোবদ্ধ হচ্ছে, একবার খুলছে। দুই ভয়াবহ প্রাণীর সামনে থরথর করে কাঁপছে রোকোফ

লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করছে শীতা। ধমক লাগালো তাকে টারজান। থামতে বললো।

টারজানের ধমকে থমকে গেল চিতাটা। লাফিয়ে উঠে ঘুরেই ছুট লাগালো রোকোফ। মারাত্মক ভুলটা করলো।

দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো শীতা। মনিবের কথা মানবে, না শিকার পালাচ্ছে, সেটাকে ধরবে! অবশেষে শিকার ধরার দিকেই প্ররোচিত করলো তাকে তার ক্ষুদে মস্তিষ্ক। মনিবের কথা অমান্য করে লাফ দিলো সে। তাড়া করলো রোকোফকে।

ছুটতে গেল টারজান। টান পড়লো বাহুতে। খামচে ধরেছে জেন। 'যেও না!' ফিসফিস করে বললো সে। 'টারজান, আমাকে ফেলে যেও না! ভয় করছে!'

দাঁড়িয়ে গেল টারজান।

চারপাশে ঘিরে আছে বনমানুষের দল। ওদের তাড়া খেয়েই টারজানকে এসে ধরেছে জেন।

টারজান আর মুগাম্বি ছাড়া আর কোনো বন্ধুকে চেনে না

বনমানুষেরা। ধরেই নিয়েছে, ওই দুজন ছাড়া আর সব মানুষই শত্রু। তাই জেনকে ধরে ছিঁড়তে গিয়েছিলো ওরা। এগিয়ে আসছে আকুত। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। দু'হাত সামনে বাড়ানো। তার ধারণা, টারজানকে আক্রমণ করেছে শাদা মেয়েমানুষটা।

কড়া গলায় আদেশ দিয়ে তাদেরকে থামালো টারজান।

রোকোফের চিৎকারে ফিরে চাইলো সবাই।

ব্রিজের শেষ মাথায় চলে গেছে রোকোফ। আর কোনো আশা নেই তার। চিতাটার দিকে চেয়ে আছে, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ।

ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে শীতা। কব্জায় পেয়ে ইঁদুরকে খেলাচ্ছে যেন বেড়াল। সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেই পারে, কিন্তু আতংকে বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে যেন রোকোফের। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে চিতাটার দিকে। সম্মোহিত করে ফেলেছে যেন তাকে উজ্জ্বল হলুদ দুটো চোখ।

ঠকঠক করে কাঁপছে রোকোফ, হাঁটুতে হাঁটুতে বাড়ি লাগছে। চেয়ে আছে নিঃশব্দে এগোনো মৃত্যুর দিকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো সে। ঘুরে রেলিঙ টপকানোর চেষ্টা করলো। লাফ দিলো শীতা।

রেলিঙের ওপর থেকে রোকোফকে টেনে নামালো চিতাটা। চিত করে ফেললো ডেক-এ। তারপর চেপে এলো শিকারের ওপর।

অস্ফুট একটা শব্দ করে টারজানের বুকে মুখ লুকালো জেন। ভয়ংকর ওই দৃশ্য দেখতে পারছে না। আস্তে করে স্ত্রীর মাথায় একটা হাত রাখলো বনের রাজা! চিলতে একটা হাসি ফুটেছে

ঠোঁটে, রোকোফের দিকে চেয়ে। স্বস্তির হাসি, সন্তুষ্টির হাসি।

চিতাটার নিচ থেকে সরে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রোকোফ, ঠেকানোর চেষ্টা করছে। বিরক্ত হয়ে পড়লো শীতা। থাবা মেরে ফালাফালা করে ফেললো শিকারের বুক, দাঁত বসিয়ে দিলো গলায়। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললো কণ্ঠনালী। বিচ্ছিরি একটা শব্দ বেরোতে শুরু করলো রোকোফের ছেঁড়া গলা থেকে, রক্ত বেরোচ্ছে পিচকারির মতো।

ধীরে ধীরে থেমে গেল হাত-পা নাড়া। মারা গেছে রোকোফ।

চার বন্দিকে ধরে আনা হলো ডেকে। থরথর করে কাঁপছে লোক-গুলো বনমানুষ আর শীতার দিকে তাকিয়ে!

ওদের মাঝে পলহিচ নেই। কিনশেডের কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। লাশগুলোর মাঝেও তার লাশ নেই। তারমানে পালি-য়েছে কোনোভাবে।

জাহান্নামে যাক ব্যাটা, ভাবলো টারজান। নাবিকদেরকে মারলো না। ওদের সাহায্যে চালিয়ে নিতেহবে জাহাজটা। প্রথমে জঙ্গল-দ্বীপে যাওয়া স্থির করলো সে। আকুতের দল আর শীতাকে তাদের পরিচিত বনভূমিতে পৌঁছে দেবে।

মুগাম্বিকেও তার গাঁয়ে পৌঁছে দেয়ার কথা বললো টারজান।

কিন্তু যেতে রাজি হলো না উয়াগাম্বি-সর্দার। সে টারজানকে ছেড়ে যাবে না। যদি কোনো দিন দেশে ফেরার ইচ্ছে হয়, জানাবে বাওয়ানাকে। সঙ্গেই যেতে চায় আপাতত।

জেনের কাছে জানতে পারলো টারজান, শাদা বাচ্চাটার খবর। জানলো, ওটা তাদের ছেলে জ্যাক নয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। সেই সঙ্গে চেপে এলো দুঃশ্চিন্তা। তাহলে কোথায় আছে তাদের ছেলে? কিনশেডে নেই, এটা নিশ্চিত। তবে কি পলভিচের কাছে?

চোদ্দ

আবার কিনশেডের গায়ে বোট ভেড়ালো আলেকজাণ্ডার পলভিচ। মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ। কালচে আকাশের পটভূমিতে বিশাল এক নাম-না-জানা দানব যেন জাহাজটা।

রোকোফ আর নাবিকেরা উঠে গিয়েছিলো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে। পলভিচ রয়ে গিয়েছিলো বোটে, সবার শেষে উঠবে। এই সময় আরেকটা ক্যানো নজরে পড়লো তার। চাঁদের ঘোলাটে আলোয় অদ্ভুত জীবগুলোকে দেখে শিউরে উঠেছিলো সে। বুঝতে পেরেছিলো, জাহাজই জীবগুলোর লক্ষ্য। তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে সরে এসেছিলো। জন্তুগুলো উঠে গিয়েছিলো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে। সব শেষে উঠলো তিনটে প্রাণী, একসঙ্গে। এক নিগ্রো, একটা বিশাল বনমানুষ আর একটা কালো চিতা। চিতার দুই থাবা দু'দিক থেকে ধরেছিলো বনমানুষ আর নিগ্রোটা। ওটাকে বয়ে তুলে নিয়েছিলো জাহাজে। খানিক পরেই শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি, লড়াই। আর কাছাকাছি থাকেনি পলভিচ। দ্রুত দাঁড় বেয়ে সরে গিয়েছিলো দূরে।

তীরের কাছাকাছি গিয়ে অপেক্ষা করেছিলো পলভিচ। লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কিনশেডে নীরবতা নেমে এসেছে। তারপরও আরো ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করেছে সে। এখন এসে নৌকা ভিড়িয়েছে আবার জাহাজের গায়ে।

কান পেতে রইলো পলভিচ। সতর্ক। বিপদের সামান্যতম ইঙ্গিত পেলেই আবার পালাবে। কিন্তু না, কোনোরকম শব্দ হলো না। নিঃশব্দে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো সে।

রেলিঙ টপকে আস্তে করে ডেকে নেমে এলো পলভিচ। তীক্ষ্ণ চোখে খুঁজলো ভয়ানক জানোয়ারগুলোকে। চোখে পড়লো না। কেউ নেই ডেকে। খালি, নির্জন। কোনোরকম পাহারাই নেই এখানে।

পা টিপে টিপে জাহাজের সামনের দিকে এগোলো পলভিচ। তোলাই রয়েছে হ্যাচকভার। বসে পড়ে নিচে উঁকি দিলো সে। আলো জ্বলছে একটা ঘরে। নাবিকদের ঘর।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো পলভিচ। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। টেবিলের সামনে বসে আছে কিনশেডের ফার্স্ট মেট। একমনে একটা ম্যাপ দেখছে। আর কেউ নেই ঘরে। লোকটা ভয়ংকর, জানা আছে তার। ওকে দিয়েই কাজ হবে। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে পড়লো সে।

হঠাৎ ঘুরে তাকালো ফার্স্ট মেট। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। 'পলভিচ!' ফিসফিস করলো সে। 'পালিয়ে গিয়েছিলেন, এসেছেন কেন আবার! জানোয়ারগুলো ধরতে পারলে…'

'চুপ!' চাপা গলায় বললো পলভিচ 'কোথায় ওগুলো?'

'একটা ঘরে ভরে রেখেছে ন্যাংটো দানবটা!' ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছে মেট। যেন এখুনি টারজানের পেছন পেছন ঢুকে পড়বে হিংস্র জানোয়ারগুলো।

'এসো, আমাকে সাহায্য করতে হবে। রোকোফের ঘরে যাবো।'

'আমি পারবো না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো মেট। 'ধরতে পারলে ছিঁড়ে ফেলবে!'

'অনেক সোনা দেবো তোমাকে,' লোভ দেখালো পলভিচ। 'অনেক আছে আমার ঘরে। ওগুলো আনতেই যাচ্ছি।'

চোখের পাতা কাছাকাছি চলে এলো লোকটার। লোভে চক-চক করে উঠলো ঘোলাটে-ধূসর মণিদুটো। 'অনেক মানে কতো-গুলো?'

'অনেক!' আবার বললো পলভিচ। 'দুজনের সারা জীবন চলে যাবে বসে খেলেও। কোনোমতে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারলে আরামে কাটিয়ে দেবো বাকি জীবনটা। যা আছে, তোমার অর্ধেক, আমার অর্ধেক।'

রোকোফের কি পরিণতি হয়েছে, জানে মেট। ভাবছে। শেষ অবধি লোভেরই জয় হলো। 'বেশ। চলুন যাই।'

সরু প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চললো দুজনে। জাহাজের কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। জন্তুজানোয়ারগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালো পলভিচ। মেটকে রিভলভার হাতে পাহারায় থাকতে বলে ঢুকে পড়লো ভেতরে। স্বর্ণগুলো

নিয়ে শুধু পালিয়ে যাওয়াই নয়, আরো উদ্দেশ্য আছে তার। জাহাজটাকে ধ্বংস করে দেবার ব্যবস্থা করে যাবে। ধ্বংস করে দেবে টারজানকে।

কিসে ভরে নিয়ে যাবে সোনার বাঁটগুলো? শেষে একটা বালিশের খোল খুলে নিলো সে। ওতে ভরলো সোনার বাঁট, নগদ টাকাপয়সা যা যা ছিলো রোকোফের। দড়ি দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে মুখ বেঁধে পোঁটলাটা রাখলো টেবিলে। এইবার আসল কাজ।

ডিনামাইট স্টিকগুলো কোথায় রাখা আছে, জানে পলভিচ। ওগুলো বের করলো। তাক থেকে তুলে আনলো টেবিল ঘড়িটা। তারপর গোটা দুই ড্রাই সেল, তার আর প্লায়ার্স নিয়ে কাজে লেগে পড়লো।

অভিজ্ঞ হাত। দেখতে দেখতে বানিয়ে ফেললো টাইম-বম্ব। সময় সেট করলো। বারো ঘণ্টা পর ফাটবে। এই সময়ের অনেক আগেই বোট নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যেতে পারবে সে। টারজান আর জেনের ছিন্নভিন্ন লাশ মনের পর্দায় ভেসে উঠলো তার। কুৎসিত হাসি ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে।

কাজ শেষ। বোমাটা বাংকের তলায় লুকিয়ে রাখলো পলভিচ। পোঁটলা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে।

মেটকে নিয়ে ডেকে উঠে এলো পলভিচ। পুব আকাশে আবছা হতে শুরু করেছে অন্ধকার।

'জলদি পালাও!' বললো মেট। 'জানোয়ারগুলোর ওঠার সময়

হয়ে গেছে।'

দ্রুত রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালো পলভিচ। টপকাতে যাবে, কাঁধের ওপর হাত পড়লো। ঘুরে চাইলো সে। মেটের রিভলভার উদ্যত। 'পোঁটলাটা দিন।' পাল্টে গেছে গলার স্বর।

'পোঁটলা?'

'বারে, আমার ভাগ দেবেন না? বলছি কি, পুরোই দিয়ে দিন। জঙ্গলে যাচ্ছেন, ওখানে সোনা কোনো কাজেই আসবে না। দিন।'

আলো ফুটতে শুরু করবে শিগগিরই। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়তে হবে জাহাজের কাছ থেকে। অনুনয় করলো পলভিচ, 'আমাকে কিছু অন্তত নিতে দাও। এই, তিন ভাগের এক ভাগ। প্লীজ!'

জীবনে বোধহয় এই প্রথম কারো উদ্দেশ্যে 'প্লীজ' শব্দটা ব্যবহার করলো পলভিচ।

'একটা টুকরোও না,' হাত বাড়ালো মেট। 'দিন। জলদি করুন। নইলে দিলাম ডাক টারজানকে। চিতাবাঘটার পেট ভরেনি রোকোফকে খেয়ে।'

কিছুই করার নেই পলভিচের। নীরবে পোঁটলাটা তুলে দিলো মেটের হাতে। 'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চাপলো সে।

'যতো খুশি গাল দাও, ওসব আর গায়ে মাখি না এখন। আগেও অনেক দিয়েছো। লাথি ঝাঁটা মেরেছো যখন-তখন। আজ শোধ নিলাম। যাও, জলদি কেটে পড়ো। নইলে এক এক

করে সব কটা লাথি ফিরিয়ে দেবো।' ধমকে উঠলো মেট। 'যাও!'

আর দেরি করলো না পলভিচ। প্রতিশোধ নেবে, হুমকি দিয়ে বোটে এসে নামলো। দাঁড় তুলে নিয়ে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলো তীরের দিকে। এরপরের দশটা বছর কি হালে কাটবে তার, যদি জানতো, কিছুতেই যেতো না সে জাহাজ ছেড়ে। টারজানের হাতে-পায়ে ধরে হলেও থেকে যেতো।

পনেরো

ভোর হয়েছে। ডেকে উঠে এলো টারজান। মেঘ কেটে গেছে। ঝিরঝিরে বাতাস। আকাশের অবস্থা ভালো। কোনো কারণে উপকূলের দিকে সরে গেছে ঝড়টা, এদিকে আর হবে না। জাহাজ ভাসানোর চমৎকার সময়। জঙ্গল দ্বীপে পৌঁছতে বিশেষ সময় লাগবে না। আকুতের দল আর শীতাকে ওদের দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে রওনা হবে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে।

মেটকে ঘুম থেকে ডেক-এ তুলে নিয়ে এলো টারজান। পলভিচ চলে যাবার পর এই একটু আগে শুয়েছে লোকটা। কাঁচা ঘুম ভেঙেছে, চোখ লাল টকটকে। কিন্তু সেটা বলা যাবে না টারজান-কে। পাল তোলার ব্যাপারে মনোযোগ দিলো সে।

একে একে ডেক-এ উঠে এলো অন্য নাবিকেরা। জাহাজ ছাড়তে হবে। জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হলো ওদের।

জোয়ার এলো। চরা থেকে সহজেই নামিয়ে আনা হলো জাহাজ। পাল তুলে দিয়ে নাক ঘুরিয়ে জঙ্গল দ্বীপের দিকে রওনা হলো কিনশেড।

নিচে একটা ঘরে জন্তুজানোয়ারগুলোকে তালাবন্ধ করে রাখলো টারজান। নাবিকেরা স্বস্তি পাচ্ছে এতে, কাজে মনোযোগ দিতে পারছে। বিদ্রোহ করার কথা কল্পনাই করছে না ওরা। জানে, তাহলে একজনও বাঁচতে পারবে না। সতর্ক চোখ রেখেছে তাদের ওপর টারজান আর মুগাম্বি। একটু এদিক ওদিক দেখলেই লেলিয়ে দেবে জানোয়ারগুলোকে।

রোদ ঝলমলে আটলান্টিক। তরতর করে এগিয়ে চলেছে কিনশেড।

খুব বেশি দূরে না জঙ্গল-দ্বীপ। কয়েক ঘন্টা পরই দ্বীপের রেখা চোখে পড়লো দিগন্তে। যে হারে এগোচ্ছে জাহাজ, আর বড়জোর ঘন্টাখানেক লাগবে ওখানে পৌঁছুতে।

কিনশেডের কেউই জানে না, রোকোফের কেবিনে টিক-টিক টিক-টিক করে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। এক ঘন্টা নেই আর সময়, তার আগেই এক হয়ে যাবে ঘড়ির দুটো কাঁটা, ঘটবে বিস্ফোরণ।

রেলিঙে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে টারজান আর জেন। দ্বীপের দিকে চেয়ে আছে, আলোচনা করছে নিজেদের মাঝে। তাদের ছেলে জ্যাক কোথায়, সেটা নিয়ে মন খারাপ। টারজান বললো, ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে ভালোমতো খোঁজ-খবর করবে। দরকার হলে আবার ফিরে আসবে এখানে। দুনিয়ার যেখানেই থাকুক, বেঁচে থাকলে তাকে খুঁজে বের করবেই টারজান। পলভিচ নেয়নি বলেই তার ধারনা। আর যদি নিয়ে গিয়ে থাকেই টারজানের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না সে।

ষোলো

জাহাজ নেই। নৌকা নিয়ে সাগরে ভাসতে হবে। পৌছানোর চেষ্টা করতে হবে জাহাজ চলাচলের পথে। কতোদিন থাকতে হবে নৌকায়, জানা নেই। কাজেই প্রচুর পানি আর খাবার-দাবার নিতে হবে দ্বীপ থেকে।

দ্বীপটা টারজানের চেনা। কোথায় আছে পানি, জানে। বনে খাবারেরও অভাব নেই। কাজেই ওসব জোগাড় করতে দেরি হলো না।

সেদিন আর নৌকা ছাড়ার সময় নেই। রাতটা দ্বীপেই কাটানো ঠিক করলো টারজান।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল টারজানের। দেখলো, তার গা ঘেঁষে শুয়ে আছে শীতা। একটু দূরে বসে আছে তাকুত আর তার দল। উঠে পড়লো টারজান। বন্ধুদেরকে নিয়ে খানিকক্ষণ ঘোরা-ফেরা করলো সৈকতে। চাঁদের আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে বালির সৈকত, সাগর, বনভূমি।

ভোর হলো। তৈরি হয়ে নৌকায় উঠে পড়লো যাত্রীরা। কিন-

BOI LOVER'S PULABAN

শেডের গলা-কাটা ডাকাতগুলোকে বিশ্বাস নেই। ওদেরকে একটা নৌকায় উঠে যেতে বললো টারজান। সে, জেন আর মুগাম্বি উঠলো অন্য নৌকাটায়।

নৌকায় ওঠার উপক্রম করলো শীতা। তার ধারণা, আবার কোনো অভিযানে বেরোতে যাচ্ছে ওরা। অনেক কষ্টে ওকে আর আকুতকে ঠেকালো টারজান।

ছেড়ে দেয়া হলো নৌকা। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে তীরের কাছ থেকে। পানির একেবারে কিনারে বসে আছে আকুতের দল, পাশে শীতা। গম্ভীর হয়ে গালে হাত দিয়ে রেখেছে আকুত। ধীরে ধীরে লেজ নাড়ছে শীতা। বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠলো টারজানের। একবার মনে হলো, যায়! ফিরে গিয়ে নিয়ে আসে জানোয়ারগুলোকে। কিন্তু সে যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডে, শহরে। ওখানে ওদেরকে নিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না।

ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল জঙ্গল-দ্বীপ। মনে মনে ঠিক করে ফেললো টারজান, সুযোগ পেলেই আবার কোনোদিন ফিরে যাবে সে দ্বীপটাতে।

প্রায় এক হপ্তা পেরিয়ে গেছে। এখনো ভেসেই চলেছে নৌকা-দুটো জাহাজের দেখা মেলেনি। খাবার আর পানি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আর দিন দুয়েকের বেশি চলবে না।

দু'দিন অপেক্ষা করতে হলো না। সেদিনই বিকেলে দেখা গেল জাহাজটাকে। চেঁচিয়ে, জামাকাপড় উড়িয়ে জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণ

করলো নৌকার লোকেরা। ধীরে ধীরে কাছে এসে থামলো জাহাজ। একটা ব্রিটিশ স্লুপ-অ'-ওয়ার, এইচ এম এস শোরওয়াটার।

যাত্রীদেরকে তুলে নিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন। নৌকাদুটোও তুলে নেয়া হলো। ইংল্যাণ্ডের দিকে চললো শোরওয়াটার।

বাড়িতে পা দিয়েই দেখা হয়ে গেল এমারেল্ডার সঙ্গে। কোলে বাচ্চা। তাজ্জব হয়ে গেল টারজান আর জেন। তাদের জ্যাক!

এমারেল্ডার কাছে জানা গেল, টারজান আর জেন গায়েব হয়ে যাবার দুই দিন পরে বন্দরের কাছে এক পুরোনো বাড়ি থেকে জ্যাককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাচ্চাটা ছিলো এক নিগ্রো বুড়ির কাছে

চাপে পড়ে বুড়ি জানিয়েছে, জ্যাককে তার কাছে দিয়েছে পলভিচ।

এরপর অনুমান করে ছুয়ে ছুয়ে চার মিলিয়ে নেয়া গেল। জ্যাককে হাইজ্যাক করার জন্যে পলভিচকে পাঠিয়েছিলো রোকোফ। বসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পলভিচ। সম্ভবত, তাকেও সব কথা বলতো না রোকোফ। তার প্ল্যান জানতে পারেনি পলভিচ। ধরেই নিয়েছে, জ্যাককে হাইজ্যাক করে টারজানের কাছে টাকা দাবী করবে তার বস। কাজেই ফন্দি এঁটেছে সে। অন্য একটা বাচ্চা ধরে এনে তুলে দিয়েছে রোকোফের হাতে। ভালোই ছিলো তার ফন্দি। রোকোফ নকল বাচ্চা রেখে একবার টাকা দাবী করবে টারজানের কাছে। টাকা পাবে। বাচ্চাটা ফিরে পাবার পর টারজান

দেখবে, ওটা জ্যাক নয়। তখন আবার তার কাছে টাকা দাবী করা হবে, এবার করবে পলভিচ। টাকা নিয়ে জ্যাককে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু রোকোফ যে অন্য ফন্দি এঁটে রেখেছিলো, সেটা সে জানতো না, তাই পড়লো বিপাকে।

জ্যাককে কাছছাড়া করে না আর জেন। ওকে দুধ খাওয়ানোর সময় প্রায়ই মনে পড়ে যায়, আরেকটা শিশুর কথা। তার নিজের ছেলে নয়, কিন্তু ওকেও দুধ খাইয়েছিলো সে কয়েকটা দিন! চির-দিনের জন্যে যাকে কবর দিয়ে এসেছে আফ্রিকার গহন অরণ্যে। চোখের পানি কিছুতেই ঠেকাতে পারে না সে।

একটা ব্যাপার, ওই বাচ্চাটা কার, জানতে পারলো না জেন।

—: শেষ :—

MOHIT